বাংলার শেষ ডিটেকটিভ

মনীশ গোস্বামী

স্বরলিপি ॥ কলকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ : ১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৭

BANGLAR SESH DETECTIVE : by Himanish Goswa

প্রকাশক : ধীরা চৌধুরী
স্বরলিপি
২৩এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : হিমানীশ গোস্বামী

ছেপেছেন :
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা-৯



বাংলার শেষ ডিটেকটিভ

সেদিন দেখলাম কলুটোলার মোড়ে একজন ডিটেকটিভ মরণাপন্ন। সাধারণত ডিটেকটিভেরা অমর, তাই পথ চলতে চলতে একটু কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলাম, কি দাদা মরছেন যে? আসল নন বুঝি? শুনে ডিটেকটিভটি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমি আসল ডিটেকটিভ। শুনে তক্ষুনি তাঁকে ধরে রিকশোয় করে সায়েন্স কলেজে নিয়ে গেলাম। সেখানে আমার এক বন্ধু থাকে তার চেনা খান পাঁচেক ডাক্তার আছে। কাছেই মেডিকেল কলেজ ছিল সেখানে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু কেমন যেন ভয় ভয় করল। ওখানে নাকি তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখে, ডাক্তারেরা নাকি রোগীর উপর দাঁড়িয়ে ডন বৈঠক করে, রোগীকে এবং যারা রোগীকে নিয়ে যায় তাদের ভুল ইনজেক্‌শন দেয়, বিনা কারণে দাঁত তুলে দেয়, ওষুধের বদলে বিষ দেয়, ম্যালেরিয়া হলে পা কেটে বাদ দেয়। অতএব সায়েন্স কলেজটিকে বেশি নিরাপদ মনে হল। সেখানে নিয়ে যেতেই ক্ষীণ কণ্ঠে ডিটেকটিভ বললেন, "আমাকে যেখানেই নিয়ে যান না কেন, আমি বাঁচব না। আমার পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়।"

আমার বন্ধু দ্বিজেন ডাক্তার নয়, কিন্তু সে কি সব ওষুধ টষুধ বার করে ডিটেকটিভকে খেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, "আপনাকে কোন

শত্রুপক্ষের লোক গুলি করেছে কি? কেউ কি বিষ খাইয়েছে? ধরুন খাবার টাবারের মধ্যে ইঁদুরের বিষ; কিংবা মশার কেরোসিন মিশিয়েছে কি কেউ?"

শুনে ডিটেকটিভ ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন। সে জবাবের সঙ্গে একটা করুণ ভাবও প্রকাশ যেন পেল। কেমন যেন একটা আক্ষেপের ভাব। বললেন, "না, সে সৌভাগ্য হল কই? জানেন গত তিন বছর ডিটেকটিভি লাইনে নেমেছি, এ পর্যন্ত একটা কেস পাই নি। এখন না খেয়ে মরতে বসেছি।"

আমি এবং দ্বিজেন হতাশই হলাম। কোন ডিটেকটিভ না খেয়ে মরছে দেখলে কে না হতাশ হয়? যদি দেখতাম হ্যাঁ দু পাঁচটা কামানের গোলা খেয়ে মরণাপন্ন, বা দশ তলা উঁচু বাড়ি থেকে পড়ে ঠ্যাং ভেঙেছেন, চলৎশক্তি রহিত তাহলে একটা কথার মত কথা হত। কিন্তু ডিটেকভের না খেয়ে মৃত্যু?—না খেয়ে? ভাবতেই কিরকম আমাদের একচোট হাসি পেয়ে গেল। আমি তো ডাক্তারকে আনবার জন্য ফোন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দ্বিজেন বলল, কি লাভ? না খেয়ে যারা মরে তাদের বাঁচানো যায় না। এক কোবরেজি করা চলতে পারে।

আমি বললাম, "সে কি রকম? জানতাম তো তোমার কোবরেজিতে বিশ্বাস নেই!"

দ্বিজেন বলল, "কোবরেজি ওষুধে কি হয় তা জানি না, এবং তাতে আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু কোবরেজির একটা জিনিসে আমার বিশ্বাস এ রোগী বাঁচবে। বাঁচলেও বাঁচতে পারে।"

আমি বললাম, "মকরধ্বজ?"

দ্বিজেন বলল, "না, কাটলেট।"

সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে একজনকে দোকানে পাঠানো হল—ছখানা কোবরেজি কাটলেট আনবার জন্য। আমাদের খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড! দেখলাম কাটলেটের নাম শুনেই মরণাপন্ন ডিটেকটিভ উঠে বসেছেন। এতক্ষণ মেঝেতে শুয়েছিলেন।

দ্বিজেন বলল, "এবার আপনার কথা বলুন।"

ডিটেকটিভ বলতে শুরু করলেন: "আমার ভেতর ডিটেকটিভ হবার উপাদান ছিল প্রচুর। আমি এরোপ্লেন চালাতে জানি, গাড়ি চালাতে পারি, হাতিতে চড়তে পারি, শুপুরি গাছ, নারকেল গাছও চড়তে পারি। একবার বৃটিশ গায়নায় আখের খেতে তিন মাস কেবল আখ খেয়ে কাটিয়েছি। কলাগাছের ভেলায় চড়ে দুবার অ্যাটলান্টিক সমুদ্র পারাপার করেছি। আমি রিভলবার এবং গুলতি দুই-ই ছুঁড়তে পারি। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ। আমি একবার কেষ্টপদ বলে আমার এক বন্ধুর ঠাকুর্দার ম্যাপ চুরি যাওয়ায় তা খুঁজে দিয়েছি আফ্রিকার এক জঙ্গল থেকে!"

দ্বিজেন হাঁ হয়ে সব কথা শুনছিল। হঠাৎ সে বলল, ঠাকুর্দার ম্যাপ? সে আবার কি?"

ডিটেকটিভটি খিট খিট করে হাসলেন। বললেন, "ছেলেমানুষ নন তাহলে আপনারা? হা-হা—ছোটবেলায় আমার যত বন্ধু ছিল তাদের যত ঠাকুর্দা মারা গিয়েছিল, প্রত্যেকের মরবার সময় অন্তত একখানা করে গুপ্তধনের মানচিত্র উইল করে দিয়ে গিয়েছিল। সে সব ম্যাপ প্রায়ই সরিকেরা সরাতো। সরিকদের কাজই ছিল ম্যাপ গায়েব করা, এবং আসামের জঙ্গলে বা আফ্রিকায় গিয়ে খুনোখুনি করা। আপনারা ছেলেমানুষ হলে বুঝতে পারতেন ব্যাপারটা। কিন্তু যখন গুপ্তধনের ম্যাপের কথা জানেন না তখন ধরে নিচ্ছি আপনারা ছেলেমানুষ নন্।"

কি অসাধারণ মেধা! কি অসাধারণ প্রতিভা! আমরা যে ছেলেমানুষ নই তা কত সহজে ধরে ফেললেন। আর এমনি প্রতিভা কলুটোলায় মারা যেতে বসেছিলেন, এবং না খেয়ে! সত্যি, আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি চালু হওয়া সত্ত্বেও ডিটেকটিভেরা রাস্তায় মরবে কেন? এবং না খেয়েই বা মরবে কেন?

আমরা বললাম, "সত্যি আমরা ছেলেমানুষ নই।"

ডিটেকটিভ পকেট থেকে বার করলেন একটা কৌটা। তা

থেকে খানিক নস্যি নিয়ে নাকে দিলেন। তারপর বললেন, "কৈ, কাটলেট কই ?"

বলেই চুপ। আধঘন্টা কেটে গেল, একটি কথা বলানো গেল না তাঁকে দিয়ে। তারপর কাটলেট এলে ছটা কাটলেট একসঙ্গে খেয়ে ফেললেন। দশ গেলাস জল খেলেন। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কৈ মশাইরা, আপনারা খেলেন না যে বড় !"

আমি ভদ্রতা করে বললাম, "কৈ আমাদের খিদে তেমন পায়নি। দ্বিজেন অত ভদ্রতার ধার ধারে না। সে বলল, "আপনি খেয়ে নিলেন, আমাদের জন্য রইল কই ?"

শুনে ডিটেকটিভ মশাই আবার খিট খিট করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, "খেয়েছি কি সাধে ? গত তিন বছর মশাই না খেয়ে রয়েছি বলতে গেলে। আমাদের গুলি সহ্য হয়, বিষ সহ্য হয়, কিন্তু না খেয়ে থাকা একদম সহ্য হয় না। তাও তো আমি তিন বছর টিঁকে ছিলাম। শুনছি ব্যোমকেশের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। ডিটেকটিভদের প্রত্যেকেরই অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে।"

আমি বললাম, "সে কি মশাই, ব্যোমকেশের মত নামজাদা ডিটেকটিভেরও না খেয়ে থাকতে হয় ?" ডিটেকটিভ বললেন, "তবে আর কি বলছি। দেশে চুরি ডাকাতি রাহাজানি সবই বেড়ে গেছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঘণ্টায় দশ হাজার খুন হবে এই ইণ্ডিয়ায় মশাই, বলে রাখছি, রাহাজানির সংখ্যা মিনিটে হাজার হবে। হীরে চুরির সংখ্যা হবে দৈনিক পোনের। এ সবই হিসেব কষে বার করা। কিন্তু ডিটেকটিভ—প্রাইভেট ডিটেকটিভ তৈরির কোন প্ল্যান নেই। প্রাইভেট সেক্টরে অন্তত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হচ্ছে না। কেবল তাই নয়, আজকাল লোকে খুন হলে আর ডিটেকটিভ ডাকে না।"

আমি বললাম, "লক্ষ লক্ষ লোক ডিটেকটিভ গল্প পড়ে যে !"

ডিটেকটিভ মশাই বললেন, "পড়ে। ঐ পর্যন্তই, কিন্তু কিচ্ছু শেখে কি তারা ? তাহলে তো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মশাই লাখে লাখে শিক্ষিত লোক বেরুত—সেখানেও তো ছাত্ররা পড়ে !! পড়ার সঙ্গে

কাজের সম্পর্ক নেই। বাঙালা দেশের ডিটেকটিভ সব গল্প সর্বস্ব। একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ আমার চোখে পড়েনি।"

"তবে যে ব্যোমকেশের কথা বললেন?"

ডিটেকটিভ বললেন, "সেও তো গল্পেরই ডিটেকটিভ। বাঙলা দেশে সত্যিকারের ডিটেকটিভ একমাত্র আমি। আমিও হয় সাতদিনের মধ্যে মরব, নয়ত এ পেশা একদম ছেড়ে দেব।"

তারপর একটু থেমে বললেন "পেশা-ই বটে! এ পর্যন্ত একটা কেস কেউ আনেনি আমার কাছে! ভাবতে পারেন? একটি কেস নয়! তা ছাড়া বন্ধু বান্ধব আগে যারা ছিল সব আমার কাছ থেকে এখন দূরে সরে গেছে।"

আমরা বললাম, "আহা!"

ডিটেকটিভ বললেন, "আহা অনেকেই করে—আমাকে একটা চাকরি দিতে পারেন? যে কোন চাকরি—যে চাকরিতে উপরি পাওয়া যায়। যদি না দেন ত আমি ডাকাতি সুরু করব। ডাকাতি সুরু করা আগেই উচিত ছিল।"

বলেই তিনি নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেলেন।

এর দুমাস পরের খবর বলছি। ডিটেকটিভের সঙ্গে আবার রাস্তায় দেখা। আবার তিনি মরছেন বলে মনে হল। আবার সাহায্য করতে ছুটে গেলাম। হাত ধরে তুললাম। আমার দিকে ডিটেকটিভ তাকালেন—তারপর বললেন, "বুঝলেন, দাদা, এই প্রফেশনই বেছে নিলাম। মরার ভাণ করলে লোকে খাওয়ায়, কিছু দেয়, সেদিন আপনি যেমন দিয়েছিলেন! আপনি যান, আপনি দুবার ঠকবেন কেন? বলে না লোকে ঠকে একবার? যান মশাই, যান!"

পতিত ডিটেকটিভের দিকে তাকালাম। কেমন যেন মনে হতে লাগল ও ঠিক পথই বেছে নিয়েছে। ভিক্ষে করার নতুন কৌশলে মুগ্ধ হলাম। আরো মুগ্ধ হলাম তার সত্যবাদিতার জন্য। হ্যাঁ, একে ডিটেকটিভ তায় সত্যবাদী এরকম যোগাযোগ প্রায় ঘটে না।



বাসটা হাসতে হাসতে চলে গেল

বাসে যখন উঠি তখন একা আমি—আর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি সমেত কণ্ডাক্টার। এই শীতের সন্ধ্যেয় আর কেউ বেরয়নি দেখে প্রথমে প্রবল আনন্দ হল। এত ফাঁকা বাসে জীবনে আর কখনো উঠিনি। ওদিকে অবশ্য ড্রাইভারটাও রয়েছে—সে দিব্যি হর্ণ দিতে দিতে বাসটিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি উঁকি মেরে দেখলাম, মাঝে মাঝে দু-একটা প্রেতমূর্তির মত কেউ কেউ রাস্তা পার হচ্ছে, বা হতে চেষ্টা করছে—ওদের কানের কাছে হর্ণের আওয়াজ পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙের কাটা পায়ের পেশীর সঙ্গে বৈদ্যুতিক সংযোগ হলে যেমন পেশীটা কুঁচকে যায় আবার সোজা হয়, তেমনি ওরাও হচ্ছে, থমকাচ্ছে। ড্রাইভারের বোধ হয় তাতেই আনন্দ, সে ক্রমাগত বিদ্যুৎ-হর্ণ দিচ্ছে। আমি তখনও বসিনি। এতগুলো সীটের কোনটিতে বসব তাই কেবল ভাবছি—একদম সামনে ঠিক ড্রাইভারের পেছনে বসা যায়—কিন্তু তাহলে আমাকে ওই বিশ্রীমুখো কণ্ডাক্টার দেখতে হবে আধটি ঘণ্টা। মনে মনে ভাবলাম, একি মামদোবাজী নাকি যে ঐ আধঘণ্টা সময় ঐ বিশ্রী লোকটিকেই দেখতে হবে? আমার কি একটা সাধারণ বুদ্ধি সুদ্ধিও নেই?

তাহলে ডানদিকের ঐ সীটগুলির একটায় বসলে কেমন হয়? বসতে যাব, কিন্তু ভেবে দেখলাম, তাতে খুব সুবিধে হবে না। তাতে

বাস থামলেই; বা বাসের গতি মন্থর হলেই আমি এপাশ ওপাশ করতে থাকব। ঐ সীটে বসলেও কণ্ডাকটারের চেহারা আমার নজরে পড়বেই। ঐ কণ্ডাকটারটা আমাকে এতক্ষণ দেখছিল, হঠাৎ বলল, কি দাদা, টেনে উঠেছেন নাকি? আমি বললাম, কি বিশ্রী প্রশ্ন! আমি ট্রেনে উঠব কেন, এটা তো বাস—আর তুমিই তো জানো এটা বাস!

কণ্ডাকটার আমার চোখের কাছে তার চোখ নিয়ে এল। প্রায় দেড় ফুট দূরে দুটো চোখকে রেখে বলল, "খবরদার! এক পা কাছে আসিস যদি আর! এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার, টুকরো করে দেব তোদের ধরে!" আমি বললাম, তারপর? কণ্ডাকটার হা-হা করে হেসে বলল, তারপর কি আর মনে নেই। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, মনে পড়বে ঠিকই একদিন, ওরকম হয়। আমি তো কত কি ভুলে গেছি। এই বলে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটির মধ্যে হাত পুরতেই আমার মুখটা একটা মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম, ঐ ব্যাগের মধ্যে একটা দাবা খেলার বই পুরে নিয়েছি। ঐ বইটা মালিককে ফেরত দিতে হবে আজই—আর সেই জন্যই প্রায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি বলা যায়। হঠাৎ বইটাকে না পেয়ে আমার কেমন যেন সব অর্থহীন মনে হতে লাগল। আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, বাঁধকো, থামকো—স্লো-ডাউন করকো!! কিন্তু বাসটি থামল না, বাঁধলো না, স্লো-ডাউনও করল না। কেবল ঐ কণ্ডাকটার বলল, কি হয়েছে আপনার, দেখি জিভ বার করুন দিকি।

ভাবলাম, এই সব ইয়ার্কিবাজদের কষে চড় মারাই উচিত। কষে চড় মারতামও, কিন্তু আমার একটা হাত ঝোলায়, অন্য হাতটা দিয়ে একটা রড ধরে দাঁড়িয়ে আছি। কি করব ভাবছি। ঐ লোকটাকে চড় মারতে হলে, ঝোলা থেকে বাঁ হাত বার করতে হয়, তারপর উপরের রড ধরে ডান হাতে চড় মারতে হয়। ভাবলাম, দূর ছাই, ওসব করতে করতে লোকটা দূরে সরে যাবে, আর আমার অত কষ্ট ব্যর্থই হবে। লোকটা বোধহয় মনে মনে বুঝতে পেরেছিল

আমার মতলব। সে একটু দূরে সরে আমার নাগালের বাইরে চলে গেল। আর আমি হতাশ হয়ে নিকটতম একটা ডবল-সীটে বসে পড়লাম। বসতে বসতেই দেখলাম আমার বসতে অসুবিধে হচ্ছে, আমার প্যান্টের ডান পকেটে দাবার বইটা রয়ে গেছে। যাক বাবা, ভুল তাহলে হয়নি! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের ভেতরকার এক চাঁই সাইলুরিয়ান পাথর কড় কড় করে ভেঙে ভেঙে বড় বড় বালি হয়ে দু'শো কুইন্টাল চালের সঙ্গে মিশে গেল।

এই সময় বাসটা থেমে গেল, আর কণ্ডাকটার চেঁচিয়ে বলতে লাগল, উঠে আসুন—শেষ সুযোগ, এমন সুযোগ আর আসবে না! একদম ফাঁকা বাস!

আমি চেঁচিয়ে বললাম, ওসব না বলে বলো না কেন এই বাসটা এসপ্লানেড-এ যাচ্ছে, তাহলেই পিল পিল করে লোক উঠবে। লোকটা হঠাৎ ঝপ করে উপরে উঠে এসে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, আপনি দেবতা—ঠিক ধরেছেন সার। এই বলে সে গিয়ে চ্যাচাতে লাগল, কেউ যদি এসপ্ল্যানেড যেতে চান তো উঠে পড়ুন আর সময় নেই!

কিন্তু কেউ উঠল না। আমি বুঝতে পারলাম—কি একটা যেন গোলমাল হচ্ছে কোথাও। কি একটা ব্যাপার, যা আমার মাথায় ঢুকছে না। হয়ত শরীরের ভেতরকার বিদ্যুতের লোড শেডিং চলছে, কিংবা হয়ত শরীরের ভেতরকার কয়েকজন চরমপন্থী কোনো একটা চিন্তার স্নায়ুর উপর ধকল চালাচ্ছে। কলকতার দিকে বাস চলছে, অথচ কেউ উঠছে না এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। এরকম ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। প্রথম! ঠিক করলাম, রাত্রে গিয়েই খবরের কাগজের অফিসে বসে হেডলাইন লেখাতে হবে, যাত্রীহীন বাস—কোলকাতায় প্রথম। তারপরই মনে হল, যাত্রীহীন বাস তো নয় এটা, এটায় তো আমিই রয়েছি যাত্রী। তখন মনে হল, হেডলাইনটা হবে, কোলকাতায় প্রথম, সারা বাসে একজন যাত্রী! হ্যাঁ এবারে ঠিক হয়েছে বলে মনে হল কিন্তু এতে বাস

মালিকেরা খুব তাগুাই-ফাগুাই মারবে—বলবে, আমাদের দারুণ ক্ষতি হয়। সমস্ত বাসে একজন মাত্র যাত্রী নিয়ে আমাদের চলতে হয়। হয়ত প্রতি টিকিট ১০ পয়সার জায়গায় আঠারো টাকা করবার দাবি জানাবে ; আর কোন্ এক কমিশন বসবে আর ঝটপট রায় দেবে, হ্যাঁ হ্যাঁ কথাটা ঠিকই, তবে প্রতি টিকিট ১৮ টাকা নয় এটা বাড়াবাড়ি —মালিকদের দাবি ন্যায্য নয়। প্রতি টিকিটের ভাড়া হওয়া উচিত ২৯ টাকা, কেন না—দেখা গেছে প্রতি টিকিট ১৮ টাকা করে হলেও সরকারী বাসেরা লস খায়। সরকার তখন ওটাকেই রাউণ্ড ফিগারে ত্রিশ টাকা করে দেবে। কেননা টায়ারের দাম প্রতিটিতে বেড়েছে ৮৭ পয়সা !

বাসটা কয়েক শো গজ গিয়েছে, হঠাৎ বাইরে কয়েকজন গুণ্ডার মত আওয়াজ করে বলতে লাগল, পেছনের চাকা ঘুরছে না ! পেছনের চাকা ঘুরছে না ! তাই শুনে বাসের ড্রাইভার ঘচাং করে বাসটাকে থামিয়ে দিল, আর সেই সঙ্গে হুড়মুড় করে বেশ কিছু লোক বাসে উঠে পড়ল। তখন আমার হঠাৎ খেয়াল হল, এত বড় বাসে কণ্ডাকটার মাত্র একটা ছিল কেন ? ওর কষ্টের কথা ভেবে, আমার চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল। একজন আমার পাশে এসে বসেছিল, সে বলল, আ মোলো যা, এই লোকটা আবার কাঁদতে লেগেছে যে ! আমি বললাম, শাট আপ ! আমি মোটেই কাঁদছি না।

আমি ডবল সীটের ডান দিকে বসেছিলাম। আমার ডান পাশের জানালা দিয়ে কোলকাতাটা হুড়মুড় করে উত্তরদিকে পালাতে লাগল—কি জন্য কে জানে ? আমি দেখলাম, একটা দিবারাত্র-ফটো-তোলা-হয় মার্কা দোকান দুমদাম পালাল, মনে হয় কিছু একটা অপরাধ করেছে সে। এ ছাড়া আর সবাই পালাল, পালাল না কয়েকটা দুষ্টু গাড়ি—তারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল আর বিশ্রী রকম হর্ণ দিতে লাগল।

এই সময় একজন বলল, হ্যাঁ দাদা—আপনি পচা মাছ কিনলেন কত দিয়ে ? কে কাকে বলল বুঝতে পারলাম না। ভীড় বেড়েছে

বাসে। লোকেরা কেউ কেউ কথা বলছে আস্তে আস্তে, কিন্তু কেবল জোরে জোরে যে সব কথা হচ্ছে তারই খানিকটা শোনা যাচ্ছে। অন্য একজন বলল, মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই, পচা মাছ আমি কিনেছি কে বলল?

ঠিক এই সময় মনে হল পচা মাছের গন্ধ সমস্ত বাসেই ছড়িয়ে পড়েছে। আমি চেঁচিয়ে বললাম, পচা মাছ পচা মাছ—আলবত পচা মাছ!! আমার কথা শুনে একদল স্লোগান দিয়ে উঠল, পচা মাছ যুগ যুগ জিয়ো, যুগ যুগ জিয়ো!! ঐ দুবার স্লোগান দিয়েই তারা চুপ করল। ওদিকে কণ্ডাকটার বলল, আপনি ঐ পচা মাছ নিয়ে নেমে যান দাদা—তিষ্ঠোনো যাচ্ছে না। মাছওলা লোকটি বলল, আমি দশ হাজার টাকা বাজী ফেলতে পারি এ মাছ পচা নয়। আর একজন বলল, আপনার টাকা শস্তা হতে পারে, কিন্তু আমাদের টাকা মশাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা। আপনার মত ব্ল্যাকের কারবার করি না মশাই—আপনার কাছে দশ হাজার টাকা তুচ্ছ মনে হতে পরে। কিন্তু আমাদের কাছে একটা নয়া পয়সাও রক্ত দিয়ে তৈরী।

একটি বাচ্চা ছেলে বোধ হয় উঠেছিল, শুনতে পেলাম একটি সরু গলা, মা—মাছটা কখন পচল? মা, মাছেরা কখন পচে?

দু-তিনজন বলল, শুনলেন তো, বাচ্চা ছেলেটাও বুঝতে পেরেছে মাছটা পচা। হঠাৎ বাচ্চা ছেলেটার চিৎকার শোনা গেল, ঐ মাছ আমার নাকে লেগেছিল, ওটা পচা নয়। পচা অন্য কিছু।

—বাচ্চা ছেলের পাকা পাকা কথা! কে যেন মন্তব্য করল।

—মাছটা কি? মানে, মাছটা রুই না কাতলা, নাকি অন্য কিছু? একজন বুড়োটে গলায় প্রশ্ন করল। অন্য একজন বুড়োটে গলায় জবাব দিল, সে দিয়ে আপনার দরকার কি মশাই—পচা মাছ, বাস, হয়ে গেল—মানে, বারোটা বেজে গেছে ওটার, তার ওটা যে মাছই হোক না কেন।

প্রথম বুড়োটে গলা চিৎকার করে বলে উঠল, পচা মাছ ঠিকই

পচা মাছ, বলেছে কথাটা ঠিক। কিন্তু মশাই একটা কথা—আমরা যে গন্ধ পাচ্ছি সেটা শুঁটকী মাছের গন্ধ।

গন্ধ তো নয়, গন্ধমাদন্! আমার পেছনের একজন মন্তব্য করল। আজকাল দেখেছি, যেখানে যা খুশি হক না কেন, লোকেরা খুশিমত মন্তব্য করে। অথচ বছর তিনেক আগে সব চুপ চাপ বসে থাকত।

হুম করে বাসটা থেমে গেল—আর কতকগুলি লোক মাছ সমেত লোকটিকে চ্যাংদোলা করে নামিয়ে দিল। লোকটা কেবলি বলতে লাগল, আমার মাছ পচেনি—টাটকা মাছ ষোলো টাকা কিলো!

—আবার টাকার শাসানি হচ্ছে! বলল একজন। মন্তব্যই বলা যায় এটাকে।

প্রত্যেকে এই ঘটনায়, খুশি হয়ে হাততালি দিল। একজন মহিলা বলে উঠলেন, বাবাঃ এত পচা মাছ নিয়ে লোকটা উঠেছিল, কি ঘেন্নার কথা। এখন আর গন্ধ নেই—বাঁচা গেছে ?

বুড়োটে গলার আওয়াজ শোনা গেলঃ গন্ধ যায়নি—গন্ধ যায়নি, গন্ধ আছে!! তারপর বাসে পচা মাছের গন্ধ আছে কি নেই তাই নিয়ে দারুণ সংসদীয় বিতর্ক গোছের শুরু হল। চারিদিকে হইচই রইরই কারবার চলতে লাগল। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে বলল, ভোট নেওয়া হক! ভোট নেওয়া হক!! আর ঠিক সেই সময় সকলেই একবাক্যে রায় দিল পচা গন্ধ নেই। কিন্তু বাস আবার চলতে থাকল, তখন আবার পচা গন্ধ এল নাকে।

তখন সকলে বলল, বাস থামান বাস থামান! থামাও বাস, বাস থামাও, বাস থামাও, বাঁধকে, বাস রোখো!

আর কি আশ্চর্য! বাস থামতেই গন্ধটাও চলে গেল তৎক্ষণাৎ। ভৌতিক কারবার! ভৌতিক কারবার। একজন বলে উঠল।

এদিকে ব্যাপারটা ঠিকই বোঝা গেল। লরি ভর্তি শুঁটকি মাছ আমাদের বাসের কাছাকাছি চলছিল, ইলিশ মাছ হাতে লোকটি বাসে উঠতেই ঐ লরিটি এসে ঠিক আমাদের বাসের পেছনে দাঁড়ায়। গন্ধমাদন তখন শুরু হয়—তারপর বাসটা থামতেই লরিটা এগিয়ে

যায়, তখন আর গন্ধ থাকে না, আবার বাস চললে লরিটার কাছে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আবার গন্ধ শুরু হয়। ইলিশওলাকে মিছিমিছি চ্যাংদোলা করে ফেলে দেওয়া হল! কিন্তু কি আর করা যায়, সংসদীয় গণতন্ত্রে এসব ছ'পাঁচবার ঘটবেই—কেউ ঠেকাতে পারবে না, এমন কি সবুজ বিপ্লবের পরের দিন সকালে যেমন জিভটা কিরকম বিশ্রী তেতো তেতো লাগে তেমনি ব্যাপার প্রত্যেক দেশের ইতিহাসে সাঁইত্রিশবার (গড়) দেখা দেয়। কেউ ঠেকাতে পারে না।

এদিকে মাছি-কাগজের মত বাসে লোক উঠছে তো উঠছেই। একটা সুবিধে, আমি ছ-সীটওলার একটি দখল করে আছি। জানালার ধারে থাকায় বাইরের হাওয়াও একটু লাগছে নাকে, কানে, কপালে। শীতকালের পক্ষে ব্যাপারটা একটা অসমসাহসিক ব্যাপার, কিন্তু বাসের মধ্যে তখন নরকের কাছাকাছি উত্তাপ। ছুটি সিটের একটিতে বসে থাকার ফলে বাসে যত লোকই হক না কেন, আমার কোনো অসুবিধে নেই। আর আমার পাশের লোকটি রোগা হওয়াতে আমি সিটের প্রায় শতকরা সাড়ে চুয়ান্ন ভাগ নিয়ে বেশ জমিদারী জমিদারী একটা ভাব মনে আনছি। পাশের লোকটি বেশ ভালই। সাত চড়ে রা নেই লোকটির বলে মনে হয়। প্রথম থেকে উঠেই বসে বসে ঢুলছিল। বোধ হয় হাওড়া বা শেয়ালদার এনকয়ারি অফিসে কাজ করে লোকটা, নইলে অমন ঢুলবে কেন? কিন্তু এ কি ব্যাপার? আমার পাশে একজন তো নয়, ছজন লোক বসে আছে কেন, কেন, কেন? ছজন লোকের তো বসার কথা নয়। এ কি কারবার অ্যাঁ?

আমি কি একই লোককে ডবল দেখছি? কিন্তু তা তো নয়। আমার পাশের লোকটার তো গোঁফ নেই, চশমাও নেই। হতে পারে আমি নারাণদার কথায়, নেহাত গুরুজনের আদেশ মাথা পেতে এগারো পেগই টেনেছি বোধ হয়, নাকি সাত পেগ? আমার ঠিক খেয়াল নেই। খেয়াল নেই, কেন না চার পেগের পর থেকেই আমি একটাকে ছুটো দেখছি। তার মানে, যখন পঞ্চম গ্লাস টানছি তখন আসলে আমার চোখে সেটাই পঞ্চম এবং ষষ্ঠ এক সঙ্গে। আবার

হয়ত দুটো গ্লাস এক সঙ্গে টেবিলে রেখেছি, সত্যিকারের বাস্তব দুটি গ্লাস, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমার মাথাটা ইয়ে হয়েছে তো তাই একটাকেই দুটো দেখছি। তবে পরের পয়সায় হলে আমি আর শুনি না। নারাণদা বলেন, কখনো এসব ব্যাপারে না করবি না। করলেই ঠকবি। দেখ জগতে না-টানা লোকেরা কোথায় তলিয়ে গেল, ঐ দেখ হিটলার—ছুঁতো টুঁতো না একদম, শেষে কি হল দেখলি তো?

আমি তখন নিশ্চিন্ত হবার জন্য পাশের দুজন লোককে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা দুজন না একজন? দুজনে এক সঙ্গে জবাব দিল, একজন। আমি বললাম, আমিও তাই ভাবছিলাম। একজনকেই আমি দুজন দেখছি। তখন আমার মনে হল, কথাটা অন্যরকমও তো হতে পারে, হয়ত দুজনকেই আমি একজন দেখছি—হয়ত আমার পাশে চারজন লোক, আর আমি দুজন দেখছি! কিংবা পাশের লোক সংখ্যা আসলে ষোলজন, আমি দুজন দেখছি।

এই সময় আমি হঠাৎ শুনতে পেলাম, কে যেন বলছে, ওকে জুতিয়ে লম্বা করে দেওয়া উচিত। আমারও কি খেয়াল হল লোকটিকে হুঙ্কার দিয়ে সমর্থন করলাম। বললাম, জুতিয়ে ১১ ফুট লম্বা করাই উচিত, তার কম নয়! কিছু লোক হেসে উঠল। আমার সীটের ঠিক সামনে একজন টেকো বসে ছিল, পাঁচ মিনিট আগেও তার টাক ছিল, হঠাৎ তার এক মাথা ঝাঁকড়া চুল গজিয়ে গেল। আমি হাঁ করে তার পিঠে টোকা মেরে বললাম, দাদা, সিক্রেটটা বলবেন, আমারও চুলের অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। যে রেটে ঝরছে তাতে আর বড়জোর দু'বছর। বাস! লোকটি আমার কথায় সে কি হম্বি তম্বি। দাঁড়িয়ে উঠে মিহি গলায় ডাকল, কণ্ডাকটার! এই লোকটা টেনেছে আর তুমি পাবলিক বাসে ওকে অ্যালাউ করেছ? কণ্ডাকটর আমার সমর্থনে এগিয়ে এল। দুহাতের আস্তিন গুটিয়ে বলল, উনি আমার প্রথম খরিদ্দার—বাসের প্রথম বউনি। অতএব আপনি চুপচাপ বসে থাকুন। দিনকাল খুব খারাপ, কোত্থেকে কি

হয় আপনিও জানেন না, আমিও না। কি বলেন দাদারা? বলে খুব এক চোট হাসল।

আর তখন লোকটি আর কি করে ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলোতে বুলোতে আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বসে পড়ল। তবুও তার গজগজানি গেল না। আপন মনে বলতে লাগল, দেশের বারোটা বেজে গেছে—আর আশা নেই। গোল্লায় গেল সব।

আমার পাশের লোক দুটোও কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। এত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমার ঠিক সহ্য হয় না! আমার ঠিক কাছেকার লোকটির চশমা ছিল না, হঠাৎ দেখি তার চশমা হয়েছে। তার টাই ছিল না, এবারে দেখি ব্যাঙের ছবিওলা একটা টাই পরেছে। আবার খানিক পর দেখি ঐ লোকটিই একটা পাগড়া পরেছে, আর একটা নেবানো পাইপ মুখে করে হাওয়ায় কি যেন শুঁকছে। আবার তার পাশের লোকটির গোঁফ আর চশমা ছিল, হঠাৎ দেখি তার গোঁফ একেবারে নেই আর চশমা আছে বটে, মোটা ফ্রেমের নয়। তবে ওদের চাইতে সামনের লোকটির উপরই আমার নজর বেশি—এত বড় টাক ছিল যার, তার, কি আশ্চর্য! এত সুন্দর চুল হল। এর সিক্রেট বেচে লোকটা পনেরো কোটি টাকার মালিক হতে পারত। জীবনে তাকে বাসে উঠতে হত না। ইচ্ছে করলে বাড়িতে হাতি পুষতে পারত দু দশটা। আর যে রকম পেটরোল ক্রাইসিস, হাতিতে চড়েই অফিসে যেতে পারত। কিন্তু তাই বা কেন, পনেরো কোটি টাকা থাকলে তার অফিসে যাবার দরকার কি! ইচ্ছে করলে, বাড়িতেই একটা পেল্লায় অফিস বানিয়ে ফেলে হইচই রইরই দাপট শুরু করতে পারত, আর নিজেই বলতে পারত কর্মচারীদের, আমি আজ থেকে ওয়ারক-টু-রুল শুরু করছি, তোরা সব সাবধান! তারপর একটা লোক দু মিনিট দেরি করে অফিসে এলেই সঙ্গে সঙ্গে তার নামে এক বেজায় ঢ্যাড়া! তিন ঢ্যাড়া মানেই একদিনের মাইনে খতম। হঠাৎ বাঁদিকে তাকিয়ে দেখি, আমার পাশে দুজনের বদলে এখন একজন। সে একজন আবার পাবলিশার। আমার একখানা

বই ছাপবার জন্য নিয়ে আর ছাপাচ্ছে না, বলছে আমার নাকি পাবলিক নেই। তা নেওয়ার সময় কেন নিয়েছিল কে জানে। চার বছর হয়ে গেল, এক ফর্মাও ছাপেনি। আমি ভাবলাম ওর পকেট মেরে দিই। কোনদিন অভ্যেস নেই বলে হাত উঠল না, নইলে ঠিকই মেরে দিতাম। কি পেতাম কে জানে। হয়তো দুটো এক টাকার নোট আর কিছু খুচরো! ওরা সব টাকা কাছে রাখে না—টাকা ব্ল্যাক করে কোথায় যেন জমায়, মরবার পর তাদের ছেলেরা ভোগ করে দু হাতে উড়িয়ে দেবে সেই জন্য জমিয়ে যায়—শালার দল!

কিছুক্ষণ পর পাবলিশারের চেহারা বদলে গেল হঠাৎ। এরকম দুমদাম পরিবর্তন আমার কাছে কেমন যেন রহস্যময় ঠেকে। খানিক পর আমার ঘুম পায়। নারাণদার উপর রাগ হয়। এত করে বলেছিলাম অত আমি টানতে পারব না, কিন্তু জোর করে করে কত যে টানিয়েছেন কে হিসেব রাখে? নারাণদা অত টাকা কোত্থেকে পান কে জানে? রাজনীতির ধারে কাছে ঘোরেন, বনস্পতির অভাব হয় না বাড়িতে, ঘিও খান নিয়মিত, অথচ চাকরি করেন না। তার আবার তিনটে বউ। একটা নাকি জলপাইগুড়িতে রয়েছে, আর দুটোই কলকাতায়।

এই সময় আমি একটু স্বর্গের দিকে যাচ্ছি—কণ্ডাকটরের গলার আওয়াজ পেলাম। খতম! খতম! আমার গায়ে হাত দিয়ে বলছেন, খতম—জারনি খতম, নেমে যান! আমি বললাম, এসপ্ল্যানেড এসে গেছে? কণ্ডাক্টর বলল, এসপ্ল্যানেড তিনবার এসে গেছে। আবার বনহুগলিতে এসে গিয়েছি। আর যাবে না। আমি বললাম, তুমি শালা কেন আমাকে আমার অফিসের সামনে নামিয়ে দিলে না? বলে শূন্যে একটা ঘুষি মারলাম। সেই ঘুষির জোরে আমি ধপ করে পড়ে গেলাম রাস্তায়। কণ্ডাক্টর ঠুং ঠুং করে দুটো বেল দিল, আর বাসটা হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমি রাস্তায় পড়তেই কালো রঙের দুটো কুকুর এসে আমাকে শুঁকে দেখতে লাগল। এত ঠাণ্ডায় তাদের গরম নিশ্বাস মন্দ লাগল না।



গোয়া থেকে গোয়ালন্দ

"সার এই সেই লোক। অনেক তাড়া করে তবে তাকে ধরেছি—খুব ছুটে পালাচ্ছিল বর্ডার টপকে, আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। উঃ, বড্ড খাটিয়েছে!" প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল শ্যামাপদ কনস্টেবল-এর কথা।

লোকটিকে দারোগাবাবু দেখলেন। একটি লম্বা গোছের কোঁকড়া চুলওলা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের লোকটি। চোখে আবার চশমা। একটু একটু হাঁফাচ্ছিল। দেখে মনে হল না তেমন কিছু। অনেকক্ষণ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুতের স্পর্শ লাগল তাঁর। দারোগাবাবু হঠাৎ দুম করে টেবিলে ঘুষি মেরে জিজ্ঞেস করলেন, "কি মাল পাচার করছিলে তুমি, অ্যাঁ?"

"আজ্ঞে", লোকটা বলল, "মাল? আমাকে দেখে কি মাল পাচারের লোক বলে মনে হয়?"

দারোগাবাবু বললেন, "কাকে দেখে কি মনে হয় এ সব ধাঁধা-টাঁধা আমরা সমাধান করি না এখানে। তুমি বর্ডার টপকেছিলে, হাতে পাসপোর্ট নেই, বাস। আমাদের চোখে তুমি একজন বে-আইনী পাচারকারী।"

"দেখুন, আমার কথা শুনুন। আমাকে একটু দয়া করুন আপনারা। বাংলাদেশের গৌরবময় যুদ্ধ আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। কি অসাধারণ বীরত্ব, কি দারুণ ব্যাপার! সেজন্য আমি নিজের চোখে…।"

বাধা দিলেন দারোগাবাবু। এক্ষুনি ছুটো লরি ড্রাইভারকে কোণঠাসা করতে হবে। তারা ছু লরি বেগুন স্মাগল করে আনছিল ওপার বাংলা থেকে। লরি ওদিকে কেমন করে গেল সেটাই আশ্চর্য। এদিক থেকে নিশ্চয় কিছু স্মাগল করে ওদিকে নিয়ে গিয়েছিল কয়েক দিন আগে। চিনি চাল বা কিছু একটা। এই কারবার খুব চলছে কয়েক মাস ধরেই। দারোগাবাবু জানেন কেমন করে ওদের কোণঠাসা করতে হয়। এ সব তাঁর কাছে নস্যি, কিন্তু একটা লোক প্রায় খালি হাতে পাগলের মত সীমান্ত পার হয়ে ছুটতে থাকবে এটা তাঁর কাছে নতুন ব্যাপার। তাকে বেশ করে সার্চ করা হয়েছে। তার পকেট থেকে একটা ছু টাকার নোট কিছু খুচরো, একটা সাদা নোট-বই আর ছুটো বলপয়েন্ট পেন বেরিয়েছে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটির। পাঞ্জাবিটি ছেঁড়া, ধুতিও। হাতে একটা কম দামী আঙটি আছে, আর চপ্পল। একজন লোক খালি হাতে এমন সীমান্ত পার হতে পারে, দারোগাবাবু কখনো ভাবতে পারেন না। বললেন, "মনে হচ্ছে তুমি গভীর জলের মাছ। স্মাগল একটা কিছু করছিলে ঠিকই—কিংবা এও হতে পারে স্মাগল করে ফিরে যাচ্ছিলে। খোঁজখবর করতে হবে: বাংলাদেশের সঙ্গে তোমার কত দিনের কারবার?"

"বাংলাদেশ মানে যেটা পূর্ববঙ্গ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যেটা পূর্ববঙ্গ।"

"না, কোনো কারবার কখনো হয় নি। আনফরচুনেটলি আমি তখনো ওদিকে যাই নি। গত পঁচিশ বছরে হুগলির একটা গ্রামেই আছি। আমি একজন লেখক।"

"লেখক?" হতাশায় দারোগাবাবু একেবারে অগ্নিশর্মা হলেন। সাধারণত লোকে রেগে অগ্নিশর্মা হন, দারোগাবাবুও ঐ রকমই ছিলেন—বরাবর রেগেই অগ্নিশর্মা হতেন এই প্রথম বুঝতে পারলেন, তিনি হতাশায় অগ্নিশর্মা হলেন। লেখকরা অপরাধী হিসেবে একেবারে থার্ড ক্লাস। তাছাড়া দারুণ কঞ্জুষ হয় তারা—এক পয়সা হাত দিয়ে গলে না। দারোগার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় প্রথম প্রথম খুব ভাল

লোক ছিলেন, দিলদরিয়া মেজাজ ছিল তাঁর—কিন্তু কি খেয়াল গেল তিনি কবিতা লিখতে শুরু করলেন, আর তার পরেই আশ্চর্য, তিনি দারুণ কঞ্জুষ হয়ে পড়লেন। অতএব তিনি বললেন, "ঠিক আছে কেটে পড়ো এবারে। আর কক্ষনো এদিক মাড়িও না। লেখক বলেই এত সহজে ছেড়ে দিলাম বুঝলে ?"

"সার!" লোকটি বলল, "আমাকে একবার ওদিকে যাবার ব্যবস্থা করে দিন, সার। আমি নিজের চোখে সব দেখতে চাই। গোয়ালন্দ যেতে চাই।"

—"গোয়ালন্দ ?" দারোগাবাবু এবারে ফোঁস করে উঠলেন। "ছেড়ে দিলাম তাতে হল না। এখন গোয়ালন্দ যাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আবদার তো খুব!"

"করে দিতেই হবে, সার!"

দারোগাবাবু বললেন, "করে দিতেই হবে এ কি মামাবাড়ির আবদার ? সীমান্তের এদিকে আমি কিছু করতে পারি—এই যেমন ধরো, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। এটা আমার এলাকা, আমার ডিসক্রিশন। কিন্তু ওপারে এক ইঞ্চি গেলেই আমার এখতিয়ার চলে গেল, বাস, আমার আধ ছটাক ক্ষমতাও নেই কিছু করার।"

"তবে যে," লোকটি বলল, "আপনি—আপনার লোক গিয়ে আমাকে ধাওয়া করে গিয়ে প্রায় সিকি মাইল দূরের থেকে ধরে আনল ? ওসব শুনছি না, আপনারা সব পারেন, দিন না করে এই উপকারটুকু। আমি একটা বই ছাপাচ্ছি। বাংলাদেশের যে সব আন্দোলন হল তার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। উঃ-একখানা বিরাট ব্যাপার। সাত শো আটাশ পৃষ্ঠায় ঠাসবুননো ছাপা। লেখা হয়ে গেছে, ছাপা প্রায় হয়ে গেছে, এখন টাইটেল পেজটা আর সূচীপত্র-টত্র এ সব কয়েক পাতা বাকী আছে। আর বাকী আছে আমার গোয়ালন্দ যাওয়া। ওখানে না গেলে আমার বই-এর মূল ব্যাপারটাই একটু ইয়ে হয়ে পড়বে।"

দারোগাবাবু ভাবলেন সাহিত্যিকেরা ওরকম একটু আবোল-

ভাবোল বকে। তাঁর ঐ আত্মীয়টিরও একটু স্ক্রু ঢিলে ছিল, তাঁর মনে পড়ল। বললেন, "আচ্ছা ভাই, তুমি একটু বসো, দেখি কি করতে পারি। তোমার পকেটে তো আবার মাত্র দুটো টাকা। ওপারকে তো কিছু দিতেই হয়, এপারকে না হয় নাই দিলে। সেও তো অন্তত এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে ত্রিশ টাকার কমে ছাড়বে না!"

লরি ড্রাইভার দুটিকে কোণঠাসা করবার সময় হঠাৎ তাঁর মনে হল, তাই তো, লোকটা একগাদা মিথ্যে কথা বলে গেল তো। একবার বলল, ওদিকে সে কখনো যায় নি অথচ আবার বলছে সে সাত শো আটাশ পৃষ্ঠার একখানা বই—সেটা আবার বাংলাদেশের যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। যদি সে নাই গিয়ে থাকে কখনো তা হলে প্রত্যক্ষদর্শী সে হয় কেমন করে? কৌতূহলী হয়ে উঠলেন তিনি। আর সময় নষ্ট না করে চটপট কোণঠাসা করে ফেললেন লরি ড্রাইভার দুটিকে। একটু মন খারাপও যে হল না তা নয়—তাদের কাছ থেকে বেগুন ছাড়া আর কোনো রকম সাদর উপহার পাওয়া গেল না!

একটু সময় হাতে নিয়ে তিনি লোকটির কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন নোটবইতে কি যেন লিখছে। "ও আবার কি?" তিনি প্রশ্ন করলেন। "এখানে বসে আত্মচরিত লেখা হচ্ছে নাকি?"

"আজ্ঞে, না।" লোকটি বলল। "আত্মচরিত কি আর এই বয়সে কেউ লেখে? পরে উপন্যাস-টুপন্যাস লিখতে হতে পারে, তাই নোট রাখছি। গোয়ালন্দ তো এ যাত্রায় যাওয়া হল না!" বলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

দারোগা মশাই বললেন, "মিথ্যেবাদী!

লোকটি হাউমাউ করে বলে উঠল, "মিথ্যে কথা বলছি না, সত্যি বলছি। বাপের জন্মে মিথ্যে কথা কাকে বলে জানি না।"

"নাম কি তোমার, যুধিষ্ঠির?" দারোগাবাবু গর্জে উঠলেন।

নাম তো লিখে নিয়েছেন প্রথমেই—প্রতুলেশ্বর গৌরব। লোকটি আমতা আমতা করল।

"ও নাম তো তুমি বলেছ আমাদের—সত্যিকারের নাম কি কেউ এক কথায় দেয় নাকি? ঢের লোক দেখলাম, আমার হাত দিয়ে এ যাবৎ বহু গৌরবময় লোক এসেছেন গেছেন। কিন্তু নিজের আসল নাম কেউ বিশেষ এক কথায় দেয় না।"

"মাইরি বলছি, আমার নাম প্রতুলেশ্বর গৌরব।" লোকটি বলল। "এবারে ছেড়ে দিন সার—আমাকে গোয়ালন্দ পাঠানোর ব্যবস্থা করতে না পারেন, বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। দুটো টাকা আর খুচরো পকেটে ছিল সেগুলোও সার্চ করার পর আর দেখতে পাচ্ছি না।"

"আবদার!" দারোগাবাবু বললেন। "এ সমস্তই আবদার বাড়িতে পাঠানো কি কথার কথা—মামাবাড়ি এটা?"

"তবে গোয়ালন্দ! গোয়ালন্দেই পাঠিয়ে দিন না!" লোকটি করুণভাবে বলল। "বিশ্বাস করুন, গেয়োলন্দ না গেলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে আমার। অনেক ক্ষতি। এর আগে নানাভাবে বার পাঁচেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু এমন সীমান্তে পাহারা যে একবারও যেতে পারলাম না।"

"আচ্ছা, গোয়ালন্দ না গেলে ক্ষতি হবে কেন বল তো। তোমাকে তুমি বলছি বলে মনে কিছু করো না। আমার বয়স অনেক। আটাত্তর চলছে, রিটায়ার করার কথা অনেক দিন আগেই; অনেক বছর আগেই, তবে ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় বয়স কমিয়েছিলাম বারো বছর। তারপর দুবার দু রাজত্বে অ্যাফিডাভিট করে কুড়ি বছর কমিয়েছি। সবই আইনসঙ্গত ভাবেই করেছি। তোমার বয়স কত?"

"বত্রিশ চলছে।"

"আমি বলি কি, চলতে দাও বত্রিশকে। ঐ থাক। বয়সটা মন্দ নয়। দিব্যি গর্ব করে বলার মত বয়স। হ্যাঁ, বল তো এবারে গোয়ালন্দ যাবার জন্য এমন হট্টাই ফট্টাই কেন? আর যদি এমন জরুরী তাড়াই থাকে তা হলে অইনসঙ্গতভাবে ভিসা পাসপোর্ট সংগ্রহ করে গেলেই তো চুকে যেত।

লোকটি বলল, "মশাই, ভিসা, পাসপোর্ট এ সব অতি সাধারণ লোকদের জন্য। তা ছাড়া ওগুলো দলিল। কেউ পাসপোর্ট দেখতে চাইলেই মুশকিল, তা হলেই প্রমাণ হয়ে যাবে আমি কবে সীমান্ত পার হয়ে ছিলাম। তা হলে আমার বইটা, যার পটভূমিকা হল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যেটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ. সেটা যে বানিয়ে লেখা সেটা লোকে টের পাবে না? তা হলে সমালোচকরা কি ছেড়ে কথা কইবে? দাদা, দারুণ সব শত্রু রয়েছে আমাদের লাইনে। কোথায় লাগে মশাই ইয়াহিয়ার ইয়ারবৃন্দ!"

দারোগামশাই বুঝতে পেরেছেন এমনভাবে মাথা নাড়লেন। তবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে এত বড় একটা বই লিখলে তার এক বিন্দু সত্যি নয় তা হলে?"

"এর সবটাই প্রায় সত্যি।" লোকটি বলল। "অনেক কথা খবরের কাগজে পড়েছি, অনেক কথা লোকের মুখে শুনেছি। আর আমার নিজের উপস্থিতিটা কেবল বানিয়েছি। নিখুঁত গল্প, কোথাও ভুল পাবেন না। খুব খেটে লেখা।"

"পটভূমিকা হচ্ছে বাংলাদেশ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—বাংলাদেশ। বাংলার জনগণ—বইটা কাটবে দারুণ। গেরিলা ওয়ার—মেশিনগানের ঠকাঠক, লুঠ, মহিলা পীড়ন—প্রেম, গুপ্তচর, গুপ্তচরী সব ভাল ভাল মাল দিয়ে বইটাকে ঠেসেছি।"

"তাহলে তো চুকেই গেল, ভাল মাল দিয়েছো, এখন বাজারে বই ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকো, ভাবনা কি?" দারোগাবাবু বললেন।

"কথাটা ঠিকই, কিন্তু এই বই-এর সঙ্গে দু-পাঁচটা ছবি টবি না দিলে ঠিক জমবে না। ওখানে যাচ্ছি কিছু ছবি যোগাড় করতে—মানে ছবি তোলাতে। গোয়ালন্দর কাছে আমার এক বন্ধু রয়েছে, ওকে নিয়ে একটু ঘুরব-টুরব। বন্দুক পিস্তল বোমা মেশিনগান সাজিয়ে নিয়ে গেরিলা-গেরিলানী নিয়ে ছবি তোলাব—না হলে কি বই হয়? একটু খাঁটি খাঁটি ভাব এনে দিতে হবে না?"

দারোগাবাবু বললেন, "উই বাপ রে বাপ! এই সব কারবার, এমন সব নেপথ্য চক্রান্ত, বই বার করতে গেলে? তা তোমার বন্ধু গোয়ালন্দে থাকে বলেই তোমার গোয়ালন্দ যাবার জন্ম ঝোঁক? আমি এবারে বুঝতে পেরেছি।"

"না বুঝতে পারেননি।" লোকটি বলল।

"কি করে বুঝবেন? আসল ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। আমার বই-এর নাম যা দিয়েছি সেজন্যই সেখানে যেতে হচ্ছে। উপায় কি?"

"বই-এর নাম? বই-এর নাম কি দিয়েছ তুমি?"

আগে তো বুঝিনি তাই এমন একটা নাম দিয়েছি, যাতে আমাকে গোয়ালন্দে যেতেই হবে। বই-এর নাম দিয়েছি, গোয়া থেকে গোয়ালন্দ।"

"গোয়া থেকে গোয়ালন্দ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, গোয়া থেকে গোয়ালন্দ— কেমন নামটা হয়েছে?"

"দারুণ হয়েছে।" দারোগাবাবু বললেন।

"এমন নাম সচরাচর চোখে পড়ে না।"

অবশ্য দারোগাবাবুর বিশেষ কোনো নামই চোখে পড়ে না। বই-ই পড়েন না তিনি আজকাল। সেই কবে তিনি বই পড়তেন— সেসব স্মৃতি-কথাও নয়, বিস্মৃতি কথা।

"কেমন কাটবে বলুন এবার!" লোকটা বলল।

কাটবে শুনে দারোগাবাবু চমকিত হলেন? একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যেন। "কি কাটবে, কে কাটবে, কেন কাটবে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে কাটবে? অ্যাঁ কাটলেই হল?"

লোটা বলল, "কাটবে মানে বিক্রি হবে। কিরকম বিক্রি হবে বলে মনে হয়?"

দারোগাবাবু বললেন, "কে জানে কিরকম বিক্রি হবে। আমার কোনো ধারণা নেই। আমার এক আত্মীয় লেখক ছিলেন, বোধ করি এখনো আছেন—একবার বই ছাপিয়েছিলেন মনে আছে, বাইশ কপি

বিক্রি হয়েছিল।' আমিও এক কপি কিনেছিলাম। এ ছাড়া বই কি আমি জানি না, মানে কিভাবে কাটে, তা আমার মাথায় ঢোকে না। তবে মানুষ কেমন করে মানুষ কাটে, সেটা মোটামুটি আমার অজানা নয়।"

একটু হতাশ যেন হল লোকটি। মনে মনে ভাবল, একেবারে দুই মেরুর লোক।

একটু পরে বলল, "নামটা কেমন লাগল বললেন না তো ?"

"দারুণ নাম—গোয়া থেকে গোয়ালন্দ! চমৎকার নাম। বেশ একটা ধ্বনি আছে। যেন দূর থেকে ভেসে-আসা ঢাকের বাদ্যি বাজছে – গোয়া থেকে গোয়ালন্দ! গোয়া থেকে গোয়ালন্দ!"

"এখন দেখুন আপনি ভেবে," লোকটি বলল, "এমন একটা বই হচ্ছে, অথচ কেবল ছবির অভাবে বইটা মার খেয়ে যাবে এ কি হওয়া উচিত ?"

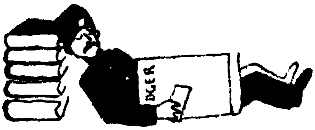
দারোগাবাবু বললেন, "না, তা হবে কেন, অপনি গোয়ালন্দ নিশ্চয়ই যাবেন। যখন গোয়ায় যেতে পেরেছেন, গোয়ালন্দই বা বাকী থাকে কেন ? আমি কি করতে পারি দেখব। একজন লেখককে দেশছাড়া করতে আমি সাহায্য সানন্দে করতে রাজী।"

লোকটি একটু ইতস্তত করল। বলল, "দেখুন, আপনাকে বোধ হয় সব কথা বলাই ভাল। আমি গোয়াতেও যাই নি।"

"অথচ বইটাব নাম গোয়া থেকে গোয়ালন্দ ? একে তো ঠকানো বলে। গোয়ালন্দে তবু তো যাচ্ছ, যাবার জন্য কোমর বেঁধেছ, এদিকে গোয়াতেই যাও নি…?"

"একেবারে ফাঁকি নয়, সার। একেবারে ফাঁকি নয়—গোয়ায় যাই নি ঠিকই, সে তো অনেক দূর, অনেক টাকা খরচার ধাক্কা, আর হাঙ্গামাও কম নয়। তাই হুগলি থেকে কলকাতা চলে এলাম, আর বাসে করে চলে গেলাম গোয়া-বাগানে। গোয়া না যাই, গোয়া-বাগানে তো গিয়েছি!"

লোকটি থামল। দারোগাবাবু মনে মনে ভাবলেন, আর কিছু না জানাই ভাল এর কাছ থেকে। সব লেখকেরই যে মাথাটার মধ্যেকার একটা দুটো করে স্ক্রু ঢিলে থাকে এ বিষয়ে আর তাঁর সন্দেহ রইল না।



একখানি চেক

একখানি চেক পেয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

দেখলাম চারিদিকে খাঁচা। তার মধ্যে সব মানুষ বসে রয়েছে। প্রথমটা অবশ্য মনে হয় চিড়িয়াখানা। তারপর যখন দেখা যায় সবাই মানুষের মত দেখতে, তখন ভুল ভাঙে।

না, জায়গাটা চিড়িয়াখানা নয়।

একটি কাউন্টারে গিয়ে বললাম, অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই।

কাউন্টারের পিছনের ব্যক্তি একটু কাষ্ঠ হাসি হাসলেন। কোনো জবাব দিলেন না। আমি আবার বললাম আমার বক্তব্য।

তখন তিনি তাকালেন। তাতেই আমি কৃতার্থ হলাম। ভাবলাম আর একটু অপেক্ষা করলেই উত্তরটা পাব।

কিন্তু উত্তর তৎক্ষণাৎ পাওয়া গেল না। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করতে হল।

তিনি আঙুল দিয়ে আমাকে একটা দিকে দেখিয়ে বললেন, "অ্যাকাউন্ট খুলবেন তা আমার কাছে এসে প্যান প্যান করছেন কেন, ওদিকে যান।"

সঙ্গে ছিল তারাপদ, আমার বহু দিনকার বন্ধু। সে সহসা ক্ষেপে

উঠল। বলল, "আচ্ছা অভদ্র লোক তো আপনি! খামোকা বাজে বাজে কথা বলছেন কেন?"

আমি তারাপদকে নিরস্ত করলাম। বললাম, "এখানে তো স্পষ্টই লেখা রয়েছে চেক জমা নেওয়া হয়। আমাদেরই ভুল হয়েছিল। আমাদের উচিত ছিল ঠিক জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হওয়া।"

তারাপদ রাগে ফুঁসতে লাগল। খাঁচার মধ্যেকার ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত মনে পকেট থেকে একটা পান বার করে মুখে পুরলেন। আমি তারাপদর হাত ধরে টেনে নিয়ে চললাম অন্যত্র।

কিন্তু এবারেও মিলল না। এবারকার খাঁচার মধ্যেকার লোকটি আমাদের স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, অ্যাকাউন্ট খুলতে যদি আমি চাই, তাহলে অন্য কাউন্টারে যেতে হবে।

আমি সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন কাউন্টার?"

খাঁচার পিছন থেকে উত্তর এল, "অত শত জানিনে মশাই। দেখুন না, খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাবেন।"

অতঃপর খুঁজতে শুরু করলাম। এ কাউন্টারে ধাক্কা, ও কাউন্টারে গালমন্দ খাওয়া ইত্যাদি অনেক কিছু করার পর আসল জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম।

বললাম, "আমি অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই।"

শুনে খাঁচার পিছনের লোকটি পাশের লোককে একটু জোরেই বললেন, "নাও এখন ঠ্যালা। আবার একটি অ্যাকাউন্ট খোলার বন্দোবস্ত হচ্ছে—একেই কাজের ঝক্কিতে অস্থির—এরকম যদি ক্রমাগত অ্যাকাউন্ট বাড়ে তা হলেই তো গিয়েছি।"

শুনে একটু ঘাবড়ালাম বলাই বাহুল্য।

বললাম, "ও দাদা শুনছেন, আমি একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই।"

এবারে খাঁচার পিছন থেকে তিনি বললেন, "অ্যাকাউন্ট খুলতে চান, খুব ভাল কথা। আসবেন একদিন।"

আমি বললাম, "এই তো এসেছি।"

"এখুনি খুলতে চান ?"

"এখুনি।"

"সেভিংস অ্যাকাউন্ট, না কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ?"

"সেভিংস।"

ভদ্রলোক বললেন, "অন্যত্র যান। এখানে নয়।"

আমি বললাম, "সে আবার কি ?"

ভদ্রলোক বললেন, "আজ্ঞে এটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলবার জায়গা।"

আমি তখন বললাম, "মাপ করবেন, আমার ভুল হয়েছে।"

সেভিংস অ্যাকাউন্টের খাঁচায় গিয়ে একটা ফর্ম পূরণ করলাম। নাম ঠিকানা ইত্যাদি। কিন্তু তাতে হল না। একজন বললেন, এই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট আছে এমন কোনো লোকের রেফারেন্স প্রয়োজন হবে।

তারাপদ বলল, "আমার জ্যাঠামশাই-এর অ্যাকাউন্ট আছে এ ব্যাঙ্কে।"

আমি আলো দেখতে পেলাম। বললাম, "চল তোর জ্যাঠার কাছে।"

তারাপদ বলল, "উপায় নেই। জ্যাঠামশায় মাস খানেক হল মাদ্রাজে চলে গেছেন।"

তারপর আমরা ভাবতে শুরু করলাম। অনেক ভেবে স্থির করলাম, ঐ ব্যাঙ্কেই লোক ধরতে হবে।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক টাকা তুলতে এসেছিলেন, শেষ পর্যন্ত আমি এবং তারাপদ তাকে ধরে বুঝিয়ে একটা সই পেয়ে গেলাম।

আর আমাদের পায় কে ?

আমরা সগর্বে ফিরে গেলাম সেই খাঁচায়।

ভদ্রলোক বললেন, "বেশ। এবারে পঁচিশ টাকা অন্তত জমা দিয়ে আসুন।"

আমি বললাম, "পঁচিশ টাকা নয়—আমার কাছে আড়াই শো টাকার চেক আছে।"

"চেক ?" ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠল। যেন জীবনে তিনি চেক কি শোনেন নি।

বললাম, "চেক দেখেননি এর আগে ? লম্বা এক টুকরো ছোট কাগজ—তাতে ব্যাঙ্কের নাম লেখা থাকে ?"

বলে চেক বার করলাম।

গর্বের সঙ্গে বললাম, "আমি বই লিখি কিনা, তাই প্রকাশক মশাই এটা দিয়েছেন।"

বললাম না একথা যে, এটি পাবার জন্য ষোলবার ঘুরেছি।

ভদ্রলোক একদম বিচলিত হলেন না। চেক দেখেই বললেন, "ওটা আমাদের ব্যাঙ্কেরই চেক।"

বললাম, "যাই হক, চেকটা জমা করে নিন।"

ভদ্রলোক বললেন, "জানেন না, অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে প্রথমেই ক্যাশ টাকা জমা দিতে হয় ?"

আমি বললাম, "আপনারা চেক নেন কি নেন না ?"

তারাপদ বলল, "চেক আপনারা প্রচলন করতে চান, না চান না ?"

ভদ্রলোক বললেন, "ও সব বাজে ফ্যাচ ফ্যাচ করবেন না—চট করে পঁচিশটা টাকা জমা দিয়ে আসুন, নইলে আপনার অ্যাকাউন্ট খোলা হবে না।"

আমাদের কাছে পঁচিশ টাকা ছিল না। তাই স্থির করলাম, ম্যানেজার জাতীয় কারুর সঙ্গে দেখা করব।

একজন ইনচার্জ ছিলেন। তিনি সব সময়েই ব্যস্তবাগীশ বলে মনে হল। একজন লোক এসে তাঁকে বলছিলেন, "কেন আমার চেক ক্লিয়ারিং-এ এই সাত দিনেও পাঠানো হয়নি ?"

সব শুনলাম।

ভদ্রলোক প্রতি মাসে চেকে মাইনে পান। ডলার চেক। প্রতি মাসেই তাঁর ডলার চেকটিকে ভাঙানোর জন্য চার পাঁচ টাকা তাঁর

বরবাদ হয়ে যায় ব্যাঙ্কের চার্জ হিসেবে। প্রায় তিন সপ্তাহ লাগে তাঁর চেক জমা পড়তে। অর্থাৎ অ্যামেরিকা থেকে ভাঙিয়ে আসতে ঐ সময় লাগে।

এবারে তিনি দু সপ্তাহ পর এসে জানতে চেয়েছিলেন, চেকটা দেরীতে পাঠানো হয়েছে কেন।

ভদ্রলোক মোটা একখানা খাতা দেখে বললেন, "দেরী? চেক ব্যাঙ্কেই পড়ে আছে পাঠানো হয়নি।"

ভদ্রলোক প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে দাবি করলেন, "কেন চেক এখনো, এই পনেরো দিন পরেও ক্লিয়ারিং-এ পাঠানো হয়নি?"

একথা শুনে ইনচার্জ ভদ্রলোক বললেন, "ব্যাঙ্কে আপনি চেক জমা দিয়েছেন, কিন্তু কবে আমরা সে চেক পাঠাব তা সম্পূর্ণ আমাদের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করে।"

"আমি কেন সাফার করব সেজন্য?"

ইনচার্জ উত্তর দিলেন, "ব্যাঙ্কে চেক জমা দিয়েছেন। এখন চুপচাপ বসে থাকুন। ঠিক সময়ে জমা একদিন না একদিন পড়বেই।"

এই সময় একজন বাইরের ভদ্রলোক বললেন, "বিলিতি ব্যাঙ্কে যেদিন ডলার চেক জমা দেবেন সেদিনই ওরা জমা করে নেবে। আর তা ছাড়া, ব্যাঙ্ক ফীও ওরা নেয় না।"

ইনচার্জ মশাই বললেন, "ওরা ব্যাঙ্কিং-এর কিছুই জানে না। ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া অত সহজ নয়। আমরা ওদের মত অন্ধ নই। আমরা কাস্টমারের টাকা এমনভাবে রাখি যে কাস্টমারকে তা তুলতে কষ্ট হয়। যত টাকা তুলতে কষ্ট হয় তত টাকা কাস্টমারের বেঁচে যায়।"

এই সব কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় দেখি দুটি দারোয়ান একটি লোককে মারতে মারতে বার করে দিচ্ছে। আমি ইনচার্জকে জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপার কি? ডাকাত টাকাত নাকি?"

ইনচার্জ বললেন, "কত কারণে এখানে লোককে বার করে দেওয়া

হয় ঘাড় ধরে তার কি সংখ্যা আছে? না, উনি ডাকাত নন, উনি আমাদের একজন ক্লায়েণ্ট।"

"ওঁকে বার করে দেওয়া হল কেন?"

"উনি বলতে এসেছিলেন, আমাদের যিনি হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট আছেন তাঁর মাথায় কিছু নেই। তাঁর সই নাকি ঠিক হয়নি, এই কথা বলে একখানা চেক ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে!"

আমি বললাম, "তার জন্য মারপিট করবার কি প্রয়োজন?"

ইনচার্জ বললেন, "হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের মামাতো ভাই যে!"

"সেজন্য আপনাদের ক্লায়েণ্ট মার খাবে?"

ইনচার্জ মশাই বললেন, "দেখুন, এই রকম প্রশ্ন করবার জন্য আপনাকেও পেটানো উচিত আমাদের—ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া উচিত বাইরে, কিন্তু এখনো তা করা যাচ্ছে না।"

আমি বললাম, "আমরা না জেনে প্রশ্ন করেছি বলে?"

ভদ্রলোক বললেন, "না, আপনারা এখনো আমাদের ব্যাঙ্কের ক্লায়েণ্ট হননি কিনা তাই!"

আমি বললাম, "লোকেরা তাহলে কি সুখে এখানে টাকা জমা দিতে আসে?"

ভদ্রলোক বললেন, "টাকা লোকে জমা দেয় কেন? তুলে নেবার জন্য? তাহলে জমা দেবার প্রয়োজন কি? তাই আমাদের ব্যাঙ্কের নীতি হল এই যে, একবার যদি কেউ জমা দেয় টাকা, তাহলে যাতে সহজে সে তুলতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। যাতে চট করে কেউ টাকা তুলতে না পারে সেজন্য নানারকম ব্যবস্থা করা আছে—চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।"

দেখলাম। চেক পাবার সঙ্গে সঙ্গে কেরানী মশাই বলছেন, শেষের 'আই' অক্ষরটি মেলেনি। আবার সই করিয়ে আনুন। শতকরা কুড়িটি ক্ষেত্রেই তাই করা হচ্ছে। শতকরা দশজন লোককে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে চেকের উপর অ্যাকাউণ্ট নম্বর লেখা নেই বলে।

তারাপদ বলল, "কিন্তু এতে লোকেদের কি দোষ বুঝলাম না। ব্যাঙ্কেরই তো উচিত চেকের উপর অ্যাকাউণ্ট নম্বর লিখে দেওয়া ?"

ইনচার্জ মশাই বললেন, "সে সব বিলিতি ব্যাঙ্কের ব্যাপার। অন্যান্য বড় বড় ব্যাঙ্কের ব্যাপার। আমাদের সিস্টেম একটু আলাদা। বড় বড় ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখবেন, চট করে টাকা জমাও দেওয়া যাচ্ছে, তোলাও যাচ্ছে। আমাদের সে রকম বাজে সিস্টেম নয়। এই দেখুন।"

দেখলাম।

দুজন বেয়ারা মেঝেতে শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তাদের হাতে কতকগুলো চেক।

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, "ওরা এখানে অমন গড়াগড়ি দিচ্ছে কেন ?"

ইনচার্জ মশাই বললেন, "ওরা চেক নিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছে যাবার সময় পথে কুড়ি মিনিট ঘুমিয়ে নেয়। আজ কেন যেন ঘুম আসছে না ওদের—তাই কেবল গড়াচ্ছে।"

তারাপদ বলল, "অদ্ভুত ভাল সিস্টেম তো ? লোকেরা যে ওদিকে অপেক্ষা করছে টাকার জন্য ?"

ভদ্রলোক বললেন, "ঐটেই তো আমাদের বিশেষত্ব। চাইলেই টাকা পাওয়া, এ কি মামাবাড়ির আবদার ? মামদোবাজি ?"

চারিদিকে তাকালাম। না, মামাবাড়ির আবদার কোথাও চোখে পড়ল না। মামাদোবাজিও নয়। বললাম, "ঠিক বলেছেন।"

তারপর আরো অনেক কিছু দেখলাম। দেখলাম তিনজন লোক দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ বোজা। জানলাম তারা গত তিন ঘণ্টা ধরে চেক জমা দিয়ে অপেক্ষা করছে। আরো বহু লোক সেখানে দাঁড়িয়ে বসে রয়েছে।

কিন্তু সমস্যার সমাধান তখনো হয়নি।

ইনচার্জকে গিয়ে বললাম, "কেবলমাত্র চেক দিয়ে কি কোনোক্রমেই অ্যাকাউন্ট খোলা যায় না?"

"কোনোক্রমেই নয়।"

"পঁচিশটা টাকা যোগাড় করতেই হবে নগদ?"

"ঠিক ধরেছেন।"

জমা দেবার আগে হঠাৎ কি যেন মনে হল। জিজ্ঞেস করলাম, "সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দিলে সুদ কত পাওয়া যাবে?"

"সুদ?"

আমি বললাম, "বড় বড় ব্যাঙ্কে শতকরা তিন টাকা সুদ দেওয়া হয়।"

ইনচার্জ বললেন, "আমাদের ব্যাঙ্কে শতকরা দেড় দেওয়া হয়। এটা দেওয়াও ভুল আমরা জানি। আমাদের আসল ইচ্ছে একদম সুদ না দেওয়া। কিন্তু লোকেরা সব এমন অর্থলোলুপ হয়ে উঠেছে যে সুদ একটা দিতেই হয়।"

আমি বললাম, "বুঝতে পারলাম। যে ব্যাঙ্ক সুদ বেশি দেয়, সেটা ব্যাঙ্কই নয়—"

ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক ধরেছেন।"

আমি চেনা একটি দোকানদারের কাছ থেকে পঁচিশ টাকা ধার করলাম।

তারপর আমার চেক এবং ঐ টাকা জমা দিলাম।

সব সমেত হল দুশো পঁচাত্তর টাকা।

এখন পর্যন্ত ঐ টাকা ব্যাঙ্কেই আছে। তোলা যায়নি। আমি গত সাত মাস ধরে টাকা তুলবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।

সই মিলছে না।

আমি নিজে সই করলাম ব্যাঙ্কের লোকের সামনে। কিন্তু তাও তাঁরা ওটাকে আমার সই বলে মেনে নিচ্ছেন না।

আমার নাকি মধ্যের অক্ষর একটি একদম মিলছে না। কিন্তু তবু একটা কথা স্বীকার করব। সই যদি মিলত প্রথমেই, তাহলে ব্যাঙ্কে আজ অ্যাকাউন্টই থাকত না।



স্ক্রিপ্ট বহির্ভূত

ভপ্…ভপ্…ঘট…ঘটাং…সাই…সিনেমার ছবি তোলা হচ্ছিল, নায়ক বলছিল নায়িকাকে, এই সুন্দর বাড়ির, এই সুন্দর সময়, আর আমরা দুজনে এখানে, কি সুন্দর…হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, পেছনের পুকুরে একটা ফুটবল এসে পড়ল। ছলাৎ করে আওয়াজ হল। নায়ক সেদিকে স্ক্রিপ্ট বহির্ভূত ভাবে তাকালেন। ভ্রূ দুবার কোঁচকালো, ফলে কপালে সব সমেত এগারোটা রেখা গোনা গেল। সাধারণত তাঁর কপালের রেখার সংখ্যা থাকে গড়ে সাড়ে চার করে। যিনি ক্যামেরা ধরেছিলেন তিনি ক্যামেরাটিকে ঠিক সময়ে থামাতে ভুলে গেলেন, ফলে বেশ কয়েক গজ ফিল্মে নায়কের ঐ কপাল কুঁচকে যাওয়ার ক্লোজ আপ উঠে গেল। এই সময় পরিচালক মশাই, বেশ একটা তরুণ বয়স্ক, চঞ্চলমতি একটি রক্তপায়ী মশাকে নিবিষ্টভাবে মারতে চেষ্টা করছিলেন বলে তিনি, 'কাট', বলতেও পারলেন না ঠিক সময়ে। অবশ্য সেই কারণে, এবং আরো অনেক কারণে প্রত্যেকেই বুঝতে পারল এই দৃশ্যটা আবার তুলতে হবে। নায়ক মুখ ব্যাজার করে একটা সিগারেট ধরালেন, নায়িকা মুখে যতখানি সম্ভব আবার পাউডার মাখালেন। ক্যামেরাম্যান ছতু পকেট থেকে একটা গুন্তি পান বার করে ফস্ করে মুখে পুরলেন, আর পরিচালক মশাই তাঁর কপালে জমায়েত হওয়া শিশির বিন্দুর মত আধ আউন্সটাক ঘাম রুমালে শুষে নিয়ে পকেটে পুরলেন।

নাঃ এই নিরিবিলি, শহর থেকে একুশ মাইল দূরের বাগান-বাড়িতেও শান্তিতে কিছু করার উপায় নেই! এই কথাটা পরিচালক মশাই ভাবলেন, আর হুকুম দিলেন, 'আবার সব প্রস্তুত করুন। ঠিক একই ভাবে। দিনের আলোর গতিক ভাল নয়। রোদ্দুর চলে গেলে রাত্রের দৃশ্য তুলবার বারোটা বেজে যাবে।' এই কথাটা বলার পরই পুকুরের ওপারের দেয়ালের উপর চারটি তরুণ মাথা দেখা দিল। কি করে যে দশ ফুট দেয়ালের উপর ছোকরারা উঠতে পারে, তা তিনি ভেবেই পেলেন না। ঐ চারটি মাথা কিন্তু কেবল দেয়ালের উপর উদয় হয়েই ক্ষান্ত রইল না। তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ও দাদারা—আমাদের একটা ফুটবল এদিকে পড়েছে দেখেছেন?' সহকারী ক্যামেরাম্যান একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ঘুম ঘুম চোখে একবার তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলেন। সহকারী পরিচালক চেঁচিয়ে বললেন, 'একটা ফুটবল পুকুরে পড়েছে!' সেই তরুণেরা চিৎকার করে হুকুম করলো, 'তা পড়েছে আর আপনারা মজা করে দেখছেন? এক্ষুনি ফেরত দিন, নইলে মেরে লাস করে কুত্তা লেলিয়ে দেবো!' বাপ্‌রে বাপ্‌ বলে কি ওরা? পরিচালক মশাই শঙ্কিত হলেন। মেরে লাস করবে আবার তার উপর কুত্তা লেলিয়ে দেবার কথা বলছে! পরিচালক মশাই এবারে নায়কের চাইতেও দ্বিগুণভাবে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তোমরা দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি।' কিন্তু ব্যবস্থা করছি বললেই তো হবে না, কে পুকুর থেকে বল তুলবে? তিনি ক্যামেরা-ম্যানকে বললেন, ছতুবাবু আপনি যদি…' ছতুবাবু বললেন, 'আমি টার্জান নাকি মশাই, ওসব পুকুরে নানাটামা আমার দ্বারা হবে না।' বলে ভুল করে তিনি ছুটো পান মুখে পুরে দিলেন। এখন নায়ককেও কথাটা বলা যায় না। নায়ক যদি বল তুলতে গিয়ে ডুবে যায় তাহলে সকলকেই ডোবাবে। নায়িকাকে তো বলা যায়ই না, অবশ্য নায়িকাকে জলে নামাতে পারলে আর সেই ছবি তুলতে পারলে দর্শক ফুর্তি করবে খুব। কিন্তু পরিচালক মশাই নায়িকাকেও বলতে পারলেন না। এই সময়ে হঠাৎ অনুরোধ করলে নায়িকা বেঁকে বসতে পারে।

'ও দাদা, তাড়াতাড়ি করুন!' সেই তরুণ মাথার দল আবার চাড়া দিয়ে উঠল। কি আর করা যায়, কোথাও কেউ তেমন রাজি না থাকায় পরিচালক মশাই নিজেই জলে নামলেন। পুরো নয়—হাঁটু জল। সেখান থেকে কয়েকটা ঢিল ছুঁড়ে বলটাকে পরপারে পৌঁছে দিলেন। এই সময় নায়ক একটু ঘুরে ওপারে গিয়ে বলটাকে ধরে দেয়ালের বাইরে ছুঁড়ে দিলেন। এই সময় সেই তরুণেরা নায়ককে চিনতে পেরে বলে উঠল, 'এ শালা অপলক কুমার যে রে!—এখানে নিশ্চয় বায়োস্কোপ উঠছে!' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেয়ালের উপরেই প্রচুর মাথা দেখা গেল। পরিচালক আকাশের দিকে তাকালেন, ঘড়ির দিকে তাকালেন, জমায়েত হওয়া মাথাগুলির দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'আর এক মিনিটের মধ্যে সব কাটুন এখান থেকে!' আর কি, পরিচালকের হুকুম। ভ্যানের মধ্যে ক্যামেরা উঠে গেল। জিনিসপত্র সাজ সরঞ্জাম সব। অন্য গাড়িগুলির মধ্যে বিধিমত সবাই দৌড়ে গিয়ে উঠে বসলেন। তিন মিনিটের মধ্যে একদিনের জন্য ভাড়াকরা বাগানবাড়ি ফাঁকা হয়ে গলে।

শেষ পর্যন্ত ছবিতে ঐ ফুটবল দেখা গেল, জল ছলাৎ করে উঠল, আর নায়ক ভুরু কুঁচকে তাকালেন—এইটুকু সিনেমায় রাখতেই হল। পরিচালকের বন্ধু ছবির প্রথম প্রক্ষেপণ দেখে বললেন, "চমৎকার ছবি হয়েছে। শালা ফটাই ল্যাং খেয়ে যাবে এমন ছবি দেখলে।" পরিচালকের আর এক বন্ধু বললেন, "দারুণ কারবার করেছেন মশাই। ফটাই এবারে ফট্ করে ফেটে যাবে!" ফটাই হলেন অন্য এক পরিচালক।

পরিচালক তবু খুশী হলেন না। নায়ক নায়িকার কথার মাঝখানে হুম্ করে একটা ফুটবল এসে পড়ল, এ নিয়ে তাঁর দুজন বিশেষ বন্ধু কোনো মন্তব্যই করলেন না, এটা তাঁর কেমন যেন লাগল। তিনি ব্যাপারটাকে উসকে দেবার জন্য বললেন, "কোন জায়গাটা সবচাইতে ভাল লেগেছিল বলুন তো?" প্রথম বন্ধুর, সত্যিকথা বলতে কি, সবচেয়ে ভাল লেগেছিল যেখানে নৌকোর উপর নায়িকা দাঁড়িয়ে আরু

হাওয়ায় শাড়ির আঁচলটিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আর প্রথম বন্ধু ভাবছিলেন, আর একটু, আর একটু…কিন্তু তিনি গম্ভীর মুখে ভেবে বললেন, "ঐ যে ঘরে নিরিবিলি যেখানে কাঠের কোকিল হঠাৎ ঘড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, কু কু…কু কু…আঃ গ্র্যাণ্ড! কি দৃশ্য, কি ক্লোজাপ, কি এফেক্ট!" দ্বিতীয় বন্ধুর সবচেয়ে ভাল লেগেছিল যেখানে নায়িকা পেটিকোট পরে কোন্ শাড়ি পরবে তাই ভাবছিল আর নেচে নেচে গান গাইছিল সেই দৃশ্যটি। কিন্তু তিনিও ভেবে বার করলেন: "ঐ যে যেখানে আকাশে চিল উড়ছিল, নীচে মড়া নিয়ে যাচ্ছে, আর মোটা ব্যবসাদার লোভী লোভী চোখে ওষুধে ভেজাল মেশাচ্ছে! কি দারুণ সমাজ সচেতনতা!" পরিচালক মশাই তবু ঐ দৃশ্যের ব্যাপারে অন্ধকারে রইলেন। অতএব তিনি নিজেই একটু আলোকপাত করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "আচ্ছা, সেই রাত্রের দৃশ্যটা কেমন মনে দাগ কাটল বলুন তো, যেখানে নায়ক বলছে, এই সুন্দর রাত্তির, এই সুন্দর সময়, আর আমরা দুজনে এখানে কি সুন্দর…"

"দারুণ!" দু বন্ধুই উচ্ছ্বসিত হলেন!

"তারপর একটা ফুটবল এসে পড়ল জলে…।" পরিচালক মশাই বললেন।

"অসাধারণ।" প্রথম বন্ধু বললেন।

"ক্ল্যাসিক!" দ্বিতীয় বন্ধু বললেন।

"ডালিরও কনসেপ্‌শনের বাইরে।" প্রথম বন্ধু বললেন।

"আমার মনে হয়" দ্বিতীয় বন্ধু বললেন, "এমন সুন্দরভাবে আপনি দেখিয়েছেন আমাদের প্রেমের অনিশ্চয়তা…যা কিনা একটুখানি পুকুরের ঢেউএর মত, ছলাৎ করে ওঠে বটে, কিন্তু মিলিয়েও যায়। রেখে যায় সেই ঢেউএর চিহ্ন কপালের কুঞ্চিত রেখায়। মশাই, বলব কি ঐ দৃশ্যে আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। একটা ফুটবল যে মানুষের ইমোশনকে এমন নাড়া দিতে পারে তা আমার কল্পনায় ছিল না।"

"ফুটবল" প্রথম বন্ধু বললেন, "আমাদের দেশের একটা প্রাণবস্তু

ব্যাপার। সেই ফুটবল এমনিতে গতিহীন। কিন্তু তাকে উপলক্ষ্য করে কত গতি, কত গুঁতোগুঁতি, কত যুদ্ধ।"

দ্বিতীয় বন্ধু বললেন, "ফুটবল জীবনকেই বোঝায়। যে জীবনে আছে খালি লাথি, আছে কষ্ট, আছে সব!"

পরিচালক মশাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর প্রোডিউসারকে ফোন করে বললেন, "ছবি তৈরি। এবারে ডিসট্রিবিউটারকে বলতে পারেন।"

পরিচালক মশাই খুশী খুশী মুখে বসে ছিলেন। ছবি দারুণ উৎরেছে। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছে। চল্লিশজন ফিল্ম সাংবাদিক তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। প্রশ্ন করছেন একের পর এক। যথাসাধ্য তিনিও জবাব দিচ্ছেন। বোম্বাইএর একটি সাপ্তাহিক কাগজের সাংবাদিক পরানজাপে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছবি তুলতে আপনার কমাস লেগেছে?"

"সাড়ে তিন মাস।" তিনি সবিনয়ে জানালেন।

"ফটাই একটা ছবি তুলতে সাত মাস লাগায়।" পরিচালকের বন্ধু জানালেন।

দিল্লির একটি কাগজের প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার জীবনের সবচেয়ে ভাল ছবি কোনটা?"

পরিচালক মশাই বললেন, "বলা শক্ত।"

পরিচালকের বন্ধু বললেন, "প্রত্যেকটিই সবচেয়ে ভাল ছবি। ফটাইএর মাত্র একটি।"

মাদ্রাজের সাংবাদিক কুপুস্বামী জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছবির কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে গভীর বলে আপনার মনে হয়?"

পরিচালক মশাই বললেন, "বলা শক্ত।"

পরিচালক মশাই-এর বন্ধু বললেন, "যেখানে ফুটবল এসে পড়ল গভীর জলে। নায়ক চমকে উঠল।"

"বাই দি ওয়ে।" একজন বিদেশী সাংবাদিক বললেন, "দৃশ্যটা

অদ্ভুত লাগল। ফুটবল। ফুটবলের এমন সুন্দর ব্যবহার এর আগে আমাদের চোখে পড়েনি।"

পরিচালকের বন্ধু বললেন, "ফটাই এ পর্যন্ত তার কোনো ছবিতেই ফুটবল দেখায়নি।"

"আচ্ছা, পরিচালক মশাই!" একজন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার প্রত্যেকটি ছবি দেখার পরই মনে হয় আপনি আসলে একজন সমাজ-দ্রোহী! সমাজের উপর আপনার এত রাগ, এত অনাস্থা কেন?"

পরিচালক মশাই বললেন, "বলা শক্ত।"

পরিচালকের বন্ধু বললেন, "ফটাইএর সমাজ সম্পর্কে কোনোরকম ধারণাই নেই!"

"আচ্ছা পরিচালক মশাই।" একজন মহিলা সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ছবি তোলার ব্যাপারে আপনার স্ত্রী কি উৎসাহ দেখান?"

"বলা শক্ত।" পরিচালক মশাই জানালেন।

"শুনেছি আপনি নাকি এর পর দুটো ছবিতে এক সঙ্গে হাত দিচ্ছেন? কথাটা কি ঠিক?" মহিলা সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন।

"বলা শক্ত।" পরিচালক মশাই বললেন।

"এ পর্যন্ত আপনি তো অনেক পড়াশুনা করছেন—এদেশের তরুণ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা আপনি কার মধ্যে দেখতে পান?" একজন সাহিত্য পত্রিকা থেকে প্রশ্ন করলেন।

"বলা শক্ত।" পরিচালক জানালেন।

"আচ্ছা", একজন বিদেশী প্রশ্ন করলেন, তিনি একটু দেরিতে এসে পৌঁছেছেন, ট্রাফিক জ্যামে আটকে গিয়েছিলেন। "আপনার ঐ ফুটবলের ব্যাপারটা আমাকে একটু বলবেন, মানে সেই অসাধারণ জায়গাটি, যেখানে নায়ক...।"

পরিচালক মশাই বললেন, "সেই ফুটবলের জায়গাটি তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সত্যি কথা বলতে কি," পরিচালক মশাই একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে

বললেন, "ঐ জায়গাটি আমি হঠাৎই তুলে ফেলেছিলাম। কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, কিছু না। নায়ক-নায়িকা বসে ছিল, কথা বলছিল। এমন সময়ে হঠাৎ ওই ফুটবলটি এসে পড়ে—পাশের মাঠে বা কোথাও ছেলেরা ঐ বলটি নিয়ে খেলছিল। জলে এসে পড়ে, অতএব ঢেউও ওঠে। নায়কও চমকে সেদিকে তাকায়। তার কপালে ভাঁজ পড়ে। এ একটা আকস্মিক ঘটনা বলতে পারেন। পরে আর রি-টেক করার মত সময় আর অবস্থা থাকে না।"

পরিচালক মশাই থামলেন।

পরিচালক মশাইএর বন্ধু বললেন, দেখুন দেখি কি বিনয়। নিশ্চয় এই দৃশ্যটির জন্য তিনি অন্তত দু বছর ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। কেননা তিনি কোনো দৃশ্যই অন্তত দু বছর ধরে না ভেবে তোলেন না।"

সকলে বলল, "বিনয় বটে।"

পরিচালকের বন্ধু বললেন, "ফটাইএর বাবার সাধ্য নেই এমন বিনয়... ।"

পরিচালক মশাই বললেন, "কাট!"



উচ্চ
শিক্ষার্থে

প্রথম থেকেই ভয় হচ্ছিল। কেমন যেন একটা অজানা রকমের ভয়। বুক তো কাঁপছিলই, এমনকি মন পর্যন্ত। কি হবে, কে জানে। কত দিনই বা থাকতে হবে কি ভাবেই বা থাকব।

হ্যাঁ, উচ্চশিক্ষার জন্য আত্মীয়-পরিজন তুচ্ছ হয়ে যায়। অন্যের বেলায় তা দেখলেও নিজের বেলায় আত্মীয়দের অতখানি তুচ্ছ করা কি সম্ভব হবে? সেই কথাটাই ভাবছিলাম। উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যেতেই হবে। কোনো উপায় নেই। কলকাতা থেকে দূরে।

প্রথমটায় ঠিক যেন বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস হয়নি আমাকে তাঁরা ছাত্র হিসেবে নেবেন। কি রকম প্রতিযোগিতা আজকাল হয় ভর্তি হবার জন্য তা নিশ্চয় কারুর অজানা নেই।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমি খড়গপুর যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। ধর্মতলা স্ট্রীটের দোকান ঘুরে ঘুরে শার্ট ট্রাউজার করালাম। মশারিও একটা কিনলাম। শুনলাম মেদিনীপুরের মশাদের নাকি মানুষের রক্ত খেতে ভালই লাগে। আগে তারা খুব বেশি খড়গপুরে যেত না—কিন্তু বর্তমানে মশারাও কর্ম সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে তাদের চিরপরিচিত পচাজল এঁদো পুকুর থেকে নতুন পচাজল এঁদো পুকুরের সন্ধানে।

অতএব মশারি একখানা কিনতেই হল। তারপর কিনলাম আমার প্রথম সুটকেস।

এর আগে কখনো সুটকেস কিনিনি। একটা কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকছিল। এই প্রথম। পকেটে টাকা নিয়ে বেরুলাম, তুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিলাম। কি জানি যদি কোনো রকম বিপদে পড়ে যাই?

দেখলাম তেমন কিছু নয় ব্যাপারটা। দোকানদারকে কিছুই প্রায় বলতে হল না। তিনি নিজেই সাহায্য করবার জন্য ব্যস্ত হলেন। এই প্রথম জানলাম, ইঞ্চি হিসেবে সুটকেস বিক্রি হয়। কখনো এক ইঞ্চির দাম এক টাকা, কখনো এক টাকা বারো আনা। কখনো কখনো বাক্সর গুণাবলীর হেরফের এই রকম দামের হেরফের, কখনো বা খরিদ্দারের হের ফেরে। যদি কেউ ময়লা, জামা ছেঁড়া জুতো সমেত সুটকেস কিনতে যান, তাহলে এক টাকায় ইঞ্চি কেনা যায়, কিন্তু সেই একই সুটকেস আবার যদি অন্য লোক চকচকে জুতো আর না-ছেঁড়া জামা পরে কিনতে যায় তাহলে ওরই দাম উঠবে এক টাকা বারো আনা।

আমাকে অতএব এক টাকা বারো আনা দামই দিতে হল।

তারপর আরো কত কি! গেঞ্জি মোজা স্যাণ্ডেল এসব তো হলই। সঙ্গে একটা ক্যামেরাও নেওয়া গেল। তারপর কিনলাম একটা ডায়েরী।

রোজই জিনিস কিনতে বেরুই। কেনা আর শেষ হয় না।

তারপর খবর দেওয়া। যত আত্মীয়-স্বজন আছেন তাঁদের প্রত্যেককে খবর দিতে হল। কলকাতার বাইরে যাচ্ছি শুনে বহু লোক বিস্ময় প্রকাশ করলেন। আমি তখন তাঁদের অভয় দিলাম। বললাম, আমরা যদি নতুন যুগের যুবকেরা কলকাতার বাইরে না যাই তাহলে ভবিষ্যতের পথ দেখাবে কে? কত আত্মীয় আমাকে অভয় দিলেন। কত আত্মীয় আবার চোখের জল ফেললেন।

যাওয়ার আর দশ দিন বাকি।

একটা দিন আসছে এবং যাচ্ছে। কেমন যেন তাড়াতাড়ি সমস্ত ঘটনা ঘটছে। সকালে বেরুচ্ছি—কলকাতায় যাঁদের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে।

তা ছাড়া ব্যস্ত থাকছি আর একটা কারণেও। খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি এমন কোনো লোককে—খড়গপুর সম্পর্কে যার অভিজ্ঞতা আছে।

কিন্তু সে রকম লোক পাওয়াই কি কম শক্ত ?

শুনলাম একদিন, টালিগঞ্জের এক সীমান্তে মূর অ্যাভিনিউয়ের এক ভদ্রলোক খড়গপুরে গিয়েছিলেন উনিশশো একচল্লিশ সালে।

খবর শুনেই সেখানে ছুটে গেলাম। নাম তারাচরণ দত্ত। বয়স এখন ষাট পেরিয়েছে। ভদ্রলোক কানে একটু কম শোনেন।

আমি বললাম, আমার কথা। ভদ্রলোক বললেন, "আপনার কোনো কথা শুনতে চাইনে। আপনি বেরিয়ে যান, আমার কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় নেই, ইচ্ছেও নেই।"

হায়রে! এতদিন পরে একটি লোক পেলাম যাঁর খড্ডপুর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে, অথচ তিনি এরকম বেঁকে বসলেন।

আমি বললাম, "তারাচরণবাবু, আমি খড়গপুরে যেতে চাই।"

ভদ্রলোকের তৎক্ষণাৎ কি পরিবর্তন। তিনি অভিভূত হয়ে বললেন, "সেখানে যেতে চান, খুব ভাল কথা—খুব ভাল কথা। আজকাল যে তবু কেউ কেউ খড়গপুরে যান এটাই আশার কথা, ভরসার কথা। তা আপনি কি সাহায্য চান বলুন, অবশ্য যদি আমি সাহায্য করতে পারি।"

বললাম, "জায়গাটা আমি দেখেই এসেছি, কিন্তু একদিনের বেশি থাকিনি। ঠিক আইডিয়া করতে পারিনি। জানেন তো স্যার, একদিনের অভিজ্ঞতা কিছুই নয়।"

ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক বলেছেন, রোম কি একদিনে তৈরি হয়েছিল? হয়নি।"

আমি হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

"রোম?"

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে আমার চাইতে বেশি হতভম্ব হলেন। বললেন, "রোম একদিনে তৈরি হয়নি—এই কথাটিই আপনাকে বলতে চাই।"

আমি বললাম, "রোম কি ?"

ভদ্রলোক অট্টহাস্য করে উঠলেন। তারপর বললেন, "রোম কি এটাও জানেন না ?"

আমি আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম।

"কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ?"

"না।"

"কোনো বিখ্যাত বাড়ি ?"

"না, হল না। রোম হচ্ছে একটা শহর। রোম কেবল শহর বললেও ভুল হবে, রোম হচ্ছে মানুষের সভ্যতার কনক্রিটের সোপান।"

আমি বললাম, "হুঁ।"

ভদ্রলোক বললেন, "এসব কথা আপনি একদম জানতেন না ?"

আমি বললাম, "ইতিহাস ভূগোল কোনকালে পড়েছিলাম, ভুলে গিয়েছি। তা ছাড়া পাস করে তো গেছি !"

ভদ্রলোক আবার অট্টহাস্য করে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "খড়গপুর সম্পর্কে আপনি কি জানতে চান বলুন আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করব।"

আমি মনে মনে বললাম, "পথে আসুন দাদা !"

কিন্তু সত্যিকারের আওয়াজ করে বললাম, "ধরুন ওখানে কি রকম খরচ টরচ হয় ?"

ভদ্রলোক মনে করবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, "সে অনেকদিন আগেকার কথা—তখনো তোমাদের সম্ভবত জন্মই হয়নি। তবে সে অভিজ্ঞতা কি তোমাদের কাজ লাগবে ?"

বললাম, "লাগবে না, কেন, নিশ্চয় লাগবে !"

ভদ্রলোক বললেন, "তাহলে লিখে নিন, চাল পাঁচ টাকা মণ। দুধ দু আনা সের, মাছ ছ আনা থেকে আট আনা সের। বেগুন এক আনা সের।"

আমি লিখে নিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, "শুনেছি তারপর দাম বেড়েছে।"

আমি বললাম, "ওখানকার জলবায়ুর কথা বলুন।"

ভদ্রলোক বললেন, "জলবায়ু চমৎকার। তবে শীতে একটু ঠাণ্ডা বেশি পড়ে, গরমে গরমও একটু বেশি।"

আমি নোট করলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওখানে চেনা কেউ আছে?"

"কেনা?"

আমি বললাম, "কেনা নয়, চেনা!"

ভদ্রলোক দশ মিনিট ভাবলেন। সেই সময়টা আমি মুর অ্যাভিনিউটা একটু দেখে নিলাম। বেশ জায়গাটি। বেশ শান্ত পরিবেশ। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

ভদ্রলোক বললেন, "চেনা লোক অনেক ছিল—সব গেছে এখন। কেউ চলে গেছে ঝাড়গ্রামে, কেউ বা জলপাইগুড়িতে।"

আমি একটু হতাশ হলাম।

বললাম, "ওখানে গেলে স্টেশনে কেউ থাকলে আমার একটু সুবিধে হত।"

ভদ্রলোক অভয় দিয়ে বললেন, "কিচ্ছু ভয় করবেন না। স্টেশন থেকে নেমে একটা রিক্শায় চেপে বসবেন। পথ চিনতে খুব কষ্ট হবে না, রাস্তায় অনেক লোক পাবেন।"

কথাটা-আমার আগে কেন মনে হয়নি তা ভাবলাম।

ভদ্রলোক বললেন, "এবারে আপনি চলে যান, ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।"

তা নেই বটে।

যাবার মাত্র তিন দিন বাকি।

এই সময় আমার এক আত্মীয় হঠাৎ ফটোগ্রাফার নিয়ে এসে হাজির ভোর বেলায়।

আমি বললাম, "একি ব্যাপার?"

আত্মীয়টি বললেন, "ছবি উঠবে।"

আমি বললাম, "কার?"

আত্মীয় ভদ্রলোক বললেন, "তুই চলে যাচ্ছিস তার জন্য একটা স্মৃতির ব্যবস্থা। আর একটু পরে সবাই আসছে ছবির জন্য।"

আমি আপত্তির একটা চেষ্টা করলাম। বললাম, "আমায় যে একটা কাজে বেরুতে হবে?"

আত্মীয় মশাই আমাকে এক ধমকে বসিয়ে দিলেন। বললেন, "যাবার আগে গ্রুপ ছবি তোলার মত বড় কাজ আর কিছু হতে পারে না।"

তিনি ঐ বিধান দিলেন। গুরুজন, অতএব কথাটা ঠেলতে পারলাম না।

ফটো তোলা হল। আমার এত যে আত্মীয়স্বজন ছিলেন তা বুঝতে পারিনি এর আগে। অবশ্য নানা রকম উৎসবে দেখা হয়েছে এঁদের সঙ্গে, কিন্তু একসঙ্গে ছবি তোলানো আর হয়নি।

ছবি তুলতে বেশ কষ্ট হল। নানা রকম লোক, তাদের নানা রকম দাবী। সবাই আমার কাছে বসতে চায়, গায়ের সঙ্গে ছুঁয়ে দাঁড়াতে চায়। কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে। চেয়ারও পঁয়তাল্লিশটির বেশি যোগাড় করা গেল না, তাই অনেককেই দাঁড়াতে হল, অনেককেই মেঝেতে বসতে হল।

ছবি তুলবার সময়েই ব্যাপারটা ঘটল। আমার এক দূর সম্পর্কের মামা বললেন, "বেচারামের ছবি কাগজে ছেপে দিতে হবে, তার সঙ্গে একটা খবরও।"

আমার আলাদা করে একটা ছবি তোলা হল। এ ছবি এবং এ খবর ছাপতে খুব বেগ পেতে হল না। তা ছাড়া খড়গপুরে যাওয়া তো রোজ সকলের ভাগ্যে জোটে না, অতএব খবরের কাগজে বেশ ফলাও করেই ছাপা হল, "আদি কলিকাতার বাসিন্দা শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র, শ্রীমান বেচারাম আগামী বৃহস্পতিবার বোম্বাই মেলযোগে খড়গপুরে রওনা হইতেছেন। শ্রীমান বেচারাম একজন কৃতী ছাত্র, তিনি গত বি, এসসি পরীক্ষায় মাত্র একুশ নম্বরের

জন্য অনার্স প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। খড়গপুরের একটি সর্বভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি আগামী পাঁচ বৎসর সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করিবেন। আমরা শ্রীমানের সাফল্য কামনা করি।"

এ খবর আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন। এতবড় খবর আপনাদের চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়।



চাঁদা

"চাঁদা।" বলল একটি মেয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে। মেয়েটি দেখতে ভাল; খুব সুন্দর একটি ব্যাগ ঘাড়ে ঝোলানো। এক হাতে একটা টিন, সেটার উপরটায় একটু ফুটো করা। তার মধ্যেই চাঁদা দিতে হয়। অনেকেই দিচ্ছে। আমার হাতে প্রচুর সময়—এক্ষুণি বাড়ি ফিরতে হবে তাও নয়। আমি মেয়েটির হাতের টিনে কি লেখা আছে দেখে ফেলেছি। তাতে বেশ লাল লাল অক্ষরে লেখা বিপ্লবী আলো! নামটা এর আগে শুনিনি। বলাম, "এটা আবার কি ব্যাপার, অ্যাঁ?"

মেয়েটি বলল, "বিপ্লবী আলো! আমরা বিপ্লবী আলো—কিছু দিয়ে যান!"

আমি বললাম, "কিছু নিশ্চয়ই দিয়ে যাব। না দিয়ে কি পার পাবার উপায় আছে। এই তো একটু আগে কালীপুজোর চাঁদা দিলুম, তারপর লিলুয়ায় ছশো না হাজার কারখানায় লক-আউট হয়েছে, সমস্ত শ্রমিকরা না খেয়ে আছে তাদের জন্য দিলুম, তারপর আমাদের পাড়ায় জলপাইগুড়ির বন্যা বাবদ কারা নাচবে, সেজন্য টিকিট কিনলাম—বিপ্লবী আলোর জন্যও কিছু নিশ্চয়ই দেব!"

মেয়েটি বলল, "বাজে কথা বলবেন না। কালীপুজো তো হয়ে গিয়েছে, তার আবার চাঁদা কি?"

আমি বললাম, "আমি বাজে কথা বলি না। এই দেখুন রসিদ। কালীপুজোর সময় পালিয়ে ছিলাম—ওরা ধরতে পারেনি, এবারে ধরে আদায় করেছে।"

মেয়েটি বলল, "তা আমাদের কি।"

আমি বললাম, "বিপ্লবী আলো ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বলবেন একটু?"

মেয়েটি এদিকে ওদিকে তাকালো।

আমি বললাম, "সঙ্গে কেউ আছে টাছে নাকি, তাহলে কেটে পড়ি!"

মেয়েটি বলল, "না কেউ নেই। আমি দেখছিলাম পুলিশ-টুলিশ কেউ আছে নাকি। বিপ্লবীদের পুলিশ দারুণ অপছন্দ করে জানেন বোধ হয়?"

আমি বললাম, "শুনেছি কথাটা। তবে পুলিশ টুলিশ কাউকে দেখছি না—আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।"

মেয়েটি বলল, "একজন লম্বা মত, ঠোঁটের উপর সরু একটা গোঁফের রেখা, চোখে কালো চশমা এমন লোক আমার উপর সাদা পোশাকে নজর রাখছে, এ রকম কাউকে দেখতে পেলেন?"

আমি চারিদিকে তাকালাম। না—সে রকম কাউকে দেখতে পেলাম না।

বললাম, "কৈ সে রকম তো কাউকে... ।"

মেয়েটি বেশ হতাশ হল বলে মনে হল। বলল, "ভারি খারাপ ব্যাপার। আমার পার্টিতে সম্মান কমে যাবে। যদি পুলিশ ঠিক মত নজর না রাখে, তাহলে বুঝতে হবে আমি খুব বিপজ্জনক নই। আমাদের পার্টিতে আবার নিয়ম একজনকে যদি পর পর তিন দিন পুলিশ ফলো না করে, তাহলে দারুণ কথার কচকচি শুনতে হয়!"

বললাম, "চা খাবেন?"

মেয়েটি হঠাৎ যেন চমকে উঠল। বলল, "চা?"

বললাম "চা। কিংবা কফি।"

মেয়েটি বলল, "তা আপনার সঙ্গে একদম চেনা নেই কিছু না—এ রকম অবস্থায়……।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "চা কিংবা কফি কোনটা আপনার পছন্দ, বলুন?"

মেয়েটি বলল, "আধ ঘণ্টা আমার সময় আছে। তিন ঘণ্টা ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। চলুন—।"

বললাম, "চা, না কফি?"

মেয়েটি বলল, "চা।"

চায়ের দোকানে বসে বললাম, "কবে নাগাদ শুরু করছেন?"

মেয়েটি হঠাৎ যেন কথাটা বুঝতে পারল না। বলল, "কবে নাগাদ কি শুরু করছি?"

বললাম, "বিপ্লব। বিপ্লবই তো আপনারা করতে চান?"

মেয়েটি বলল, "একমাত্র তো সেই পথটাই বাকি আছে।"

আমি বললাম, "তা সেই পথটাতে আপনি যাবেন তাতে আমার কি বলবার আছে, তবে, কিনা আমি জানতে চাই, কবে নাগাদ হুল্লোড় শুরু হবে?"

"হুল্লোড়?" মেয়েটি একেবারে অগ্নিশর্মা। "হুল্লোড় কি বলছেন মশাই। মহান প্রগতিশীল বিপ্লবকে আপনি হুল্লোড় বলেন? আপনার লজ্জা হওয়া উচিত!"

কথাটা শুনে আমার লজ্জা হল। আমি মুখ নিচু করে লজ্জা প্রকাশ করতে লাগলাম। তারপর একটু লজ্জার ধাকা সামলে বললাম "শুনেছি বিপ্লবের সময় প্যারিসে দারুণ হুল্লোড় চলেছিল। খুব মদ খাওয়া-খাওয়ি, দোকানপাট লুঠ্‌ এটা সেটা…সেজন্যই হুল্লোড় কথাটা বলে ফেলেছি। কথাটা আসলে হবে খুনোখুনি, লুঠপাট—কি বলেন? নাকি আপনারা গম বিপ্লবের মত রক্তপাতহীন বিপ্লবের কথা ভাবছেন?"

বিপ্লব কথাটিকে বিকৃত করেছে আপনার মত লোক। আসলে বিপ্লব হচ্ছে মহান। দেখুন রাশিয়ায় মহান বিপ্লব হয়েছে। চীনে হয়েছে, পোলাণ্ডে হয়েছে, রুমানিয়ায় হয়েছে, আর এ সমস্ত বিপ্লবই মহান বিপ্লব। গম-বিপ্লব মহান নয়।" মেয়েটি বলল।

আমি বললাম, "আপনারা যে বিপ্লব করবেন, তা যে মহান তার প্রমাণ কি?"

মেয়েটি বলল, "আপনি কিছু জানেন না দেখছি। এই দেখুন প্রমাণ।"

বলে তার ব্যাগ থেকে একটা ছাপানো ইস্তাহারের মত কি একটা বার করল। তার অনেকখানি হাত দিয়ে ঢেকে একটা হেড লাইনের একটা অংশ কেবল দেখতে দিল। আমি দেখলাম তাতে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে "মহান বিপ্লব!"

মেয়েটি বলল, "দেখেছেন?"

আমি বললাম, "আরো কিছু দেখবার ছিল—আপনি অনেকখানিই ঢেকে রাখছেন।"

মেয়েটি চা-এ চুমুক দিয়ে বলল, 'সবটা দেখানোর নির্দেশ নেই। কেবল পার্টির লোকেরাই সবটা জানতে পারে।"

"আই সি!" আমি বললাম।

মেয়েটি বলল, "এবারে প্রমাণ পেলেন তো যে বিপ্লব মহান?"

আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম।

বললাম, "বিপ্লব না হওয়া পর্যন্ত কিংবা হওয়া না পর্যন্ত আমরা ঠিক জানতে পারব না, কি বলেন?"

মেয়েটি বলল, "সবাইকে ঠিক সময়েই জানানো হবে। এটা আবার গণবিপ্লব তো। তাই সবাইকে জানাতেই হবে!"

আমি বললাম, "তা কবে নাগাদ আপনারা মহান বিপ্লব সুরু করছেন?"

মেয়েটি বলল, "তারিখ এখনো ঠিক হয়নি।"

আমি বললাম, "কি রকম আন্দাজ খরচা পড়ে এক একটা বিপ্লবে ?"

মেয়েটি বলল, "এ আবার কি রকম বোকার মত প্রশ্ন ?"

আমি বললাম, "আপনারা চাঁদা তুলছেন বিপ্লবের জন্য, কেমন কিনা ?"

"হ্যাঁ, তা তুলছি।"

"তা আপনাদের নিশ্চয় ধারণা আছে কত চাঁদা তুলতে হবে। অর্থাৎ, কত টাকা আপনাদের বিপ্লবে খরচা হবে ?"

মেয়েটি চুপ করে রইল।

আমি বললাম, "একটা বড় বিপ্লবে নিশ্চয় দারুণ খরচ হয়। কত ঘরবাড়ি ভাঙতে হয়, আগুন জ্বালতে হয়, ব্রিজ ওড়াতে পোড়াতে হয়। সাংঘাতিক সব কাণ্ডকারখানা করতে হয়। খরচ তো একটা হবেই !"

মেয়েটি বলল, "কত খরচ হয় তা কি আমি জানি ?"

আমি বললাম, "তবে ছোটখাট বিপ্লব, মহান বিপ্লব ছোটও হতে পারে তো ? সেগুলোর বোধহয় খরচা কম হয়। এটা গরীব দেশ তো, তাই দুম করে বিরাট বিপ্লবে হাত দেওয়া কি উচিত ?"

মেয়েটি বলল, "আমাদের বিরাট বিপ্লবই করতে হবে।"

আমি বললাম, "কিছু মনে করবেন না—আমার বিরাট বিপ্লবে একটুখানি আপত্তি আছে। আমরা হচ্ছি ছা-পোষা মানুষ। ছোটখাট কথাই ভাবতে পারি। দেখছেন তো বিরাট বিরাট সব পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে গিয়ে আমাদের কি দারুণ ডিগবাজী খেতে হয়েছে ?"

মেয়েটি বলল, "আপনি আসল ব্যাপারটাই ধরতে পারেননি। আপনাদের পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হয়েছে বলেই তো বিপ্লবের ক্ষেত্র এত উর্বরা হয়েছে। সমস্ত দেশ এখন বারুদের স্তূপ হয়েছে, এখন একটি মাত্র দেশলাই কাঠির ব্যাপার—তারপরই মহান বিপ্লবের দাবানল জ্বলে উঠবে !"

আমি কথাটা ভাবতে লাগলাম। তারপর বললাম, "আমি

ভাবছিলাম এই টাকার কথা। টাকা ছাড়া ক্যাপিটালিস্টদেরও যেমন চলে না, আপনাদেরও তাই। আপনাদেরও তাদের মত টাকা দরকার।"

মেয়েটি বলল, "টাকা মানে শক্তি। ওখারে চাঁদা দিন। বড় সময় নষ্ট হল আপনার সঙ্গে বক বক করতে।"

আমি বললাম, "সমস্ত ভারতবর্ষে আপনাদের দলে কত জন লোক রয়েছে?"

মেয়েটি বলল, "তা কয়েক হাজার হবে!"

জিজ্ঞেস করলাম, "দশ হাজার—পাঁচ হাজার—দু হাজার?"

মেয়েটি বলল, "হাজার তিনেক।"

আমি মনে মনে একটা হিসেব করলাম। বললাম, "আপনার ঐ টিনে কত টাকা উঠেছে?"

"টাকা দশেক হবে।"

আমি বললাম, "তাহলে আর টাকার দরকার নেই—যদিও আমি দশ পয়সা দিচ্ছি ঐ টিনে, যদিও দেবার প্রয়োজন ছিল না মোটেই ...।"

মেয়েটি বলল, "দশ পয়সা! দ—শ পয়সা!"

আমি বললাম, "ওটাও দেবার দরকার ছিল না। আসলে আমি দেখছি আপনাদের বিশেষ কিছুরই আর দরকার নেই। সমস্ত ভারতবর্ষ যদি বারুদের স্তূপ হয়ে আছে—এখন আপনাদের দরকার মাত্র দেশলাই-এর। হাজার তিনেক লোকের জন্য কিছু দেশলাই দরকার। যদি ইকনমি করতে চান তো একটা দেশলাই কাঠিতেই চলে যায় সব খরচা। তা আপনার তো বেশ টাকা উঠেছে, ওতে শ'খানেকেরও বেশি দেশলাই কিনবার টাকা হয়েছে। ঐ টাকায় শ খানেক বিপ্লব করার মত দেশলাই কেনা যায়। বাস্ আর কি—লেগে যান, মহান বিপ্লব করতে দেরি কেন?"

মেয়েটি বলল, "আপনি অতি অসভ্য।"

আমি বললাম, "গুডবাই!"



কালো দৈত্যের হাতের

কালো দৈত্য বলেছিলেন, এমন মুখ করে থাকবি যাতে ঐ মুখ দেখেই লোকেরা ভয় খেয়ে যায়, তা নইলে এ লাইনে কিসস্যু হবে না। প্রথম দরকারই হল লোককে ভয় খাওয়ান। লোকেরা যেন বিশ্বাস করে তুই এমন একটা কিছু করতে যাচ্ছিস কিংবা পারিস যার ফলে তার বারোটা বেজে যেতে পারে। হ্যাঁ, কালো দৈত্য এই কথাই বলেছিলেন। তারপর তাঁর কাটা কাটা দাগওলা মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর এলোমেলো চুল দেখিয়ে বলেছিলেন, এসব কি আমার জন্মগত নাকি? আমিও বেশ ভদ্দর লোকের মত দেখতে ছিলাম, কিন্তু তাতে লোকেরা আমল দেয় না। আমি যখন ভদ্দর লোকের মত দেখতে ছিলাম... বলে কালো দৈত্য অতীতের দিকে তাকিয়ে কি যেন ঝটপট দেখে নিলেন, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তখন সত্যিকারের পিস্তল ঠেকিয়েছি প্যাসেঞ্জারের নাকে, বলেছি, দিন দাদা চটপট মানিব্যাগটা আর ঘড়িটা! কিন্তু প্যাসেঞ্জার কি করেছে জানিস? মৃদু মৃদু হেসে বলেছে, কেন বাবা ইয়ারকি করছো, কেটে পড়ো! আর আমি তখন হুঙ্কার দিয়ে বলেছি, কি আমি ইয়ারকি করছি নাকি? এই দেখুন এটা সত্যিকারের পিস্তল—কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন নি। তিনি, কিংবা অন্য প্যাসেঞ্জার কেউই না।

কালো দৈত্যের বয়স হয়েছে। আগে নাম ছিল শ্যামচন্দ্র দত্ত। তিনি একটা সোফার উপর হেলান দিয়ে বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া খাচ্ছিলেন। সামনে কিছু ইলিশ মাছ ভাজা একটা প্লেটের উপর রাখা। এক পট চা রয়েছে পাশেই, রয়েছে কাপ এবং চিনির পাত্র! আগে নাম ছিল শ্যামচন্দ্র দত্ত, কিন্তু ঐ নাম শুনলে কেউ ভয় পায় না বলে তিনি নিজেই নিজের নাম রাখেন কালো দৈত্য। তিনি পোনের বছর শেয়ালদা দমদম লাইনে কাজ করেছেন। প্রথমে ছুটকো প্যাসেঞ্জারদের ভয় দেখিয়ে রাহাজানি করে শুরু করেছিলেন কেরিয়ার, পরে ওয়াগন ভাঙার কাজে হাত দেন, এবং সেই সূত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসে পড়েন। এখন তিনি রেলের কর্মজীবন থেকে রিটায়ার করে একটা সরষের তেলের কারখানা করেছেন, দুটো হোটেল চলেছে চৌরঙ্গী অঞ্চলে। তাঁর কাছে আমি চাকরী চাইতে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, চাকরীতে কি ফয়দা আছে—রোজ ভীড় বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাতায়াত করতে করতে কবে একদিন খসে যাবি এই ধরণী থেকে। তার চাইতে কাজের কাজ কর। রিস্ক নিতে শেখ। এই দেশের যুবকদের সবচেয়ে বড় দোষ কি জানিস, তারা রিস্ক নিতে জানে না। রিস্ক না নিলে কিসসু হয় না। তারপর বলেছিলেন, অবশ্য দুম করে নেমে পড়াও কোন কাজের কথা নয়। একটু আটঘাট বেঁধে নেওয়া দরকার। বুঝতেই পারছিস আজকালকার বাজার। একটু সামলে-টামলে চলতে হয়। চাকরী আমি দেব না—কেননা, সে ক্ষমতা আমার নেই। সে ইচ্ছেও নেই।

বলে তিনি একটা ইলিশ মাছের টুকরো থেকে কাঁটা বাছতে লাগলেন, তারপর কাঁটা বেছে প্লেটের এক কোণে রাখলেন। বললেন, বুঝলি কাঁটা সর্বত্র। তুই মনের খুশিতে ডাকাতি করবি কি চুরি করবি তার জো নেই।

আমি ভেবেছিলাম উনি আমাকে একটুখানি ইলিশ মাছ অন্তত দেবেন। কিন্তু তিনি দিলেন না। নিজেই প্লেট উজাড় করতে লাগলেন। তারপর বললেন, যা, আর দেখছিস কি। বেরিয়ে পড়—

খুব বিপদে পড়লে আমি আছি। যদি লাক ভাল থাকে হয়ত আজই বিকেল বেলা কিংবা রাত্তির বেলা এরকম ছু প্লেট মাছ ভাজা তোর ভাগ্যে জুটবে। তবে একটা কথা, ঐ ভালমানুষের মত মুখ করে থাকলে বিপদে পড়বি। যা কেটে পড়! আমি আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিলাম, তিনি আমাকে ডাকলেন পেছন থেকে। আমি ফিরলাম। কালো দৈত্যের মুখে হাসি হাসি ভাব। তাঁর এক হাতে একটা বড় ইলিশ মাছের টুকরো, তা থেকে সোনার রঙের তেল গড়িয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে একটা ফোঁটার আকার নিয়েছে। আমাকে বললেন, আয় একটুখানি নিয়ে যা প্রসাদ।

আমি ফিরে গিয়ে তাঁর হাত থেকে মাছের টুকরোটা নিলাম। তিনি বললেন, তোর লাক ভাল, মাছ দিয়ে সুরু করছিস তো দিনটা।

তারপর ট্রেনের টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়াই গিয়ে শেয়ালদায়। টিকিট কিনে একটা ডায়মণ্ড হারবার লোকালে উঠে বসি। আমার কোমরে একটা ছোরা গোঁজা রয়েছে। তার উপর শার্ট থাকায় ছোরাটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আমার কেবলি মনে হচ্ছে কে বুঝি দেখে ফেলল। কি রকম লজ্জা লজ্জাও করছে। আমার টিকিট কিনবার মূলেও ঐ লজ্জা। আজকালকার বাজারে টিকিট কেনাটা একটা বোকামি, কিন্তু একই দিনে ছুটি অন্যায় করতে মনটা কেমন যেন করতে লাগল, তাই শেষ পর্যন্ত টিকিটই একখানা কিনে ফেললাম। কিনে ফেলে বেশ মনে জোর এল। তখন বিকেল হয়ে আসছে। একটু পরেই সন্ধে হবে এবং সেই সময়েই মওকা। আমি কিনেছিলাম যাদবপুরের টিকিট। ঠিক করেছিলাম, যা করবার শেয়ালদা থেকে যাদবপুরের মধ্যেই করে ফেলব, তারপর যাদবপুরে নেমে শ্রীপদর বাড়িতে গিয়ে ছু কাপ চা খাব। শ্রীপদ আমার বন্ধু, তার একটা চায়ের দোকান আছে। কিন্তু ওসব কিছু হল না। ট্রেনে প্রচণ্ড ভীড়। ওর মধ্যে কোন মতে একটা কামরায় উঠে পড়লাম। প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় বালীগঞ্জে এলাম, বালীগঞ্জে হাজার পঞ্চাশেক লোক নেমে গেল বলে মনে হল—অথচ হয়ত হাজার ছুই-এক লোক মাত্র

নেমেছে। কিছু লোক উঠল, কিন্তু তবু ভীড় কমা যাকে বলে তা হল না। ঢাকুরিয়া স্টেশনেও বহু লোক নেমে গেল, কিন্তু ভীড় কমল না। এবারে আমার ভয় ভয় করতে লাগল। এখন যদি আমি কিছু না করতে পারি তাহলে যাদবপুরে নামতে পারব না, আর তা না করতে পারলেই সর্বনাশ—আমার টিকিট মাত্র যাদবপুর পর্যন্ত! আমার কি রকম যেন দুশ্চিন্তা হতে লাগল—মনটা ছটফট করতে লাগল। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখি পাশে একটা মেয়ে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ ঢলঢলে মুখটা—তাকে দেখে মনে হল একটু আদর করে দিই। ওর গলায় একছড়া হার রয়েছে, ইচ্ছে করল ওটাকে ছিঁড়ে নিই। কিন্তু এসব কিছুই করা হল না। এদিকে একজন গুণ্ডা মত লোক আমার দিকে কটমট তাকিয়ে বলল, কোমরে কি নিয়ে চলেছেন দাদা, আমার গায়ের সঙ্গে লাগছে, ছোরা-টোরা নাকি! আমার তখন ইচ্ছে করল খুব ক্রুদ্ধ মুখে তার দিকে তাকাই, যাতে সে প্রথমেই আমাকে দেখে ভড়কে যায়। আমি হাঁ-না কিছু উত্তর না দিয়ে আর একটু সরে দাঁড়ালাম। আমার মনে হল আমি ঘামছি।

ইতিমধ্যে ঢাকুরিয়া স্টেশন প্রায় এসে গেল। দুজন লোক পাঁচটা আনারস কিনে নিয়ে নামছিল, সে কারণে ট্রেনের ভীড়ের মধ্যে নানারকম মন্তব্য কানে আসতে লাগল। কেউ বলছে, শস্তায় পেলেন বলেই কি কিনতে হবে? আপনাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই, এই তো আমার আঠাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সার শার্টের কি দশা করলেন দেখুন। একজন চিৎকার করে বলে উঠল, ওরে বাবারে মেরে ফেলল রে! হঠাৎ ঐ দিকে ধস্তাধস্তির আওয়াজ হল। তারপর কে যেন বলল, দে সব আনারসগুলোকে দরজা দিয়ে ফেলে, শালারা আনারস কিনে বাবুগিরি করতে চাস তো হেঁটে বাড়ি ফেরনা বাপু, নয়তো ট্যাকসি কিংবা মিনিবাসে বাড়ি যা! যাই হোক, এইসব গোলমাল শেষ হতে না হতেই একজন লোক প্রায় ষোলটা বেলুন নিয়ে ট্রেনে উঠতে গেল। কেন যে লোকদের কাণ্ডজ্ঞান একেবারে লোপ পেয়ে গেল, জানি না।

ষোলটা বেলুন নিয়ে যে লোকটা উঠেছিল, দু মিনিটের মধ্যে দেখলাম বেলুনের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে বারোতে। তারপর হয়ত আরো কমেছে। ট্রেনের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে আসায় ঠিক গুণতে পারলাম না। ঢাকুরিয়াতে কত লোক উঠেছিল কে জানে, খেয়াল নেই, কিন্তু অনেক যে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কেননা আমি এখন কামরার মাঝখানে রয়েছি, আর কিছুতেই এক ইঞ্চির এদিক ওদিক করতে পারছি না। আমার সঙ্গে তখন লেপটে রয়েছে প্রায় এগারোজন। আমি যেদিক দিয়েই এগুতে চেষ্টা করি না কেন কিছুতেই আর ম্যানেজ করতে পারি না।

এই সময় একজনের পকেটের সঙ্গে আমার হাত ঠেকল। কি রকম যেন একটা কাগজ কাগজ ভাব, মনে হল নোটের গোছা হতে পারে। কিন্তু সে পকেটের মধ্যে হাত ঢোকায় কার সাধ্য। যতবার চেষ্টা করি ততবারই দু চারজন লোকের ধমক খেতে হয়—কি করছেন দাদা ছটফট করছেন কেন? আমি বললাম, আমি এখন নামব। শুনে একজন বললেন, নামবেন মানে? আমি বললাম, এর পরই তো যাদবপুর। আমাকে ওখানেই নামতে হবে। দরজার দিকে এগুতে গেলাম। এগুলামও ইঞ্চি দেড়েক। কিন্তু তারপরই প্রায় আড়াই ইঞ্চি পিছিয়ে আসতে হল। ইতিমধ্যে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ট্রেন থেমেছে এবং বেশ কিছু লোক নেমেওছে, কেননা, এই ট্রেন চলতে শুরু করলে দেখলাম আমার গায়ের সঙ্গে এগারো জন লোক লেপটে ছিলেন, এখন তার সংখ্যা কমে হয়েছে দশ।

বাঘা যতীন এসে গেল, কিন্তু আমার গায়ের সঙ্গে সেই দশজনই লেগে রইলেন। আমার গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকা একজন বললেন, দুঃ শালা, আমার এক দারুণ ভুল হয়ে গেছে! আমি বললাম, কি হয়েছে দাদা, কি হয়েছে? ভদ্রলোক বললেন, আমার বৌ—একদম ভুলে গিয়েছিলাম, সে বোধ হয় এখনো মনুমেণ্টের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার জন্য! বলে কিরকম চাড় দিয়ে আমাদের ভেতর দিয়ে

দিব্যি ঐ দারুণ ভীড় কাটিয়ে কেমন করে নেমে গেলেন, আশ্চর্য ! কিন্তু আমি গুণে দেখলাম আমার সঙ্গে দশজনই লেগে রয়েছেন।

এর পর গড়িয়া এল গেল, এল সোনারপুর। তারপর কি যেন তুটো স্টেশন গেল—তারপর বারুইপুর। বারুইপুরে কিছু লোক নামল, আর আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, সস্তায় বেগুন খেতে চান তো এখানেই নেমে পড়ুন ! এখানেই, এখানেই !! আমার চিৎকারে কিনা জানি না একটু ভীড় কমল মনে হল, আর সেই সুযোগে আমি বারুইপুরের প্লাটফরমের উপরে এসে পড়লাম। হয়ত একটু আগে বিষ্টি হয়ে গেছে, প্লাটফরমে জলও ছিল, কাদাও ছিল। আমি তার উপর দিয়ে পিছলে পড়লাম। তু তিনজন লোক এসে আমাকে জাপটে ধরল, আর দাঁড় করিয়ে দিল। আমার তখন ভয় করছে—আমার টিকিট তো যাদবপুর পর্যন্ত। এখন যদি ধরে ফেলে চালান করে দেয় ? আমি কাঁদো কাঁদো ভাবে বললাম, ছেড়ে দিন দাদা—আমার বাড়ী যাদবপুর। তখন লোকেরা বলল, এটার মাথা একদম গেছে বোধ হয়। যা দিনকাল পড়েছে—যাবে না ? উঃ যা সব বাজার দর—তুটো কাগজী লেবু ষাট পয়সা। কে কবে শুনেছে ?

বারুইপুর নেমে ভাবলাম, যখন এসেই পড়েছি এখানে একবার জায়গাটা দেখে নিই। আস্তে আস্তে এদিক ওদিক তাকিয়ে সুরুৎ করে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। একটা চায়ের দোকান দেখে খুব লোভ জাগল মনে। অথচ পকেটে তখন মাত্র তু টাকা, আর কিছু খুচরো। রাত্রে ঐ পয়সায় খেতে হবে। পর দিন সকালের কথাও ভাবতে হবে। দূর ছাই—যাদবপুরের টিকিটটা না কিনলেই ভাল হত। যাই হোক, চায়ের নেশা তখন পেয়ে বসেছে। আমি একটা দোকানে গিয়ে তুটো সিগারেট কিনলাম, আঠারো পয়সা নিল। কলকাতায় এই সিগারেট কেউ একুশ পয়সার নিচে দেয় না। লোকটা বোধ হয় ঠকে গেল তিনটে পয়সা। আমার একবার ইচ্ছে করল, কলকাতার দাম তুমি জেনে নিলেই আর এই তিন পয়সা তোমাকে ঠকতে হত না। আমার কাছে দেশলাই নেই। আমি বললাম,

দড়ি আছে? সিগারেটওলা বলল, দড়ি? না দাদা এখানে দড়ি বেচা হয় না, আপনি অন্য দোকানে খোঁজ করুন। আমি তখন বললাম, দড়িতে আগুন আছে? আমার দেশলাই নেই কি না? তখন সিগারেটওলা তার লণ্ঠন থেকে একটা কাগজ ধরিয়ে আগুনটা আমার মুখের কাছে নিয়ে এল, আর আমি এক সেকেণ্ডে সিগারেটটা ধরিয়ে ফেললাম। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, এই যে পাশের দোকানটায় চা বিক্রী করে এর চা কেমন? সিগারেটওলা বলল, গোরুর চোনার মত। আমি বললাম, মাইরী? লোকটি তখন আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে বলল, বিশ্বাস না হয় চেখে দেখলেই তো পারেন, কে বারণ করছে?

আমি তখন বললাম, আচ্ছা দাদা, এখানে বেগুন কোথায় পাওয়া যায়?

এই প্রশ্নটি তাকে কেন করলাম তা এখন আর মনে পড়ে না। বোধ হয় ভেবেছিলাম, জায়গাটা যখন বারুইপুর তখন এখানে নিশ্চয় বেগুন-টেগুন পাওয়া যায় ভাল মত। প্রশ্ন শুনে লোকটি আমার দিকে তুবার ক্ষিপ্রভাবে তাকাল। তারপর বলল, এখানে বেগুন পাওয়া যায় তা আপনাকে কে বলল? আমি বললাম, বইতে পড়েছি বারুইপুরের বেগুন বিখ্যাত। লোকটি বলল, তাহলে ঐ বই ছিঁড়ে ঠোঙা বানিয়ে ঝেড়ে দিন। বারুইপুরের বেগুন বিখ্যাত! বইতে লেখা আছে! বাপরে বাপ!

কিন্তু ঠিক তখনই দেখি একজন লোক এক ঝাঁকা বেগুন নিয়ে চলেছে। আমি তখন সিগারেটওলাকে বললাম, এই তো বেগুন! সিগারেটওলা আমার কথার উত্তর না দিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল— কালে কালে কত দেখব কে জানে, বারুইপুরের বেগুন! এখন আমার মনে হয় লোকটার মাথার একটা ছোট ইস্কুরুপ ঢিলে ছিল।

গোরুর চোনা শুনেও আমি ঐ চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম। এখানে সময় কাটিয়ে যখন ভীড় কমতির দিকে যাবে, আর অন্ধকার হবে তখন ফেরার পথে রাহাজানি করব মনস্থ করলাম। তাই

দোকানে গিয়ে বললাম, এককাপ গোরুর চোনা দিজিয়ে। চা-ওয়ালা বলল, ওরে তিন নম্বর কেটলির চা এককাপ দে, স্পেশাল! এরপর একটা কালো সিড়িঙ্গে বছর এগারোর ছোকরা নোংরা একটা কাপে করে নিয়ে এল চায়ের রঙের মতই একটা পদার্থ। আমি নাক বুঁজে এক চুমুক দিয়ে বুঝলাম পাশের দোকানদার একদম বাজে কথা বলেছে। এত ভাল চা আমি সচরাচর খাইনি এর আগে। ঐ দোকানে দেখলাম চারজন শিক্ষিত বেকার বসে বসে সিগারেট টানছে। ওরা যে শিক্ষিত বেকার তা বুঝলাম ওদের সিগারেট টানা দেখে। যদি দেখতাম ওরা বিড়ি টানছে তাহলে ধরে নিতাম অশিক্ষিত বেকার। আমার চেহারা ওদের কাছে নতুন ঠেকল। তারা নিজেদের মধ্যে নীচু স্বরে কি সব পরামর্শ করতে লাগল। আমার ব্যাপার-স্যাপার ভাল ঠেকল না। একজন আমার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে অন্য তিনজনকে কি সব বলল। ঠিক এই সময় একটা রোগা ল্যাজ-উঁচু বেড়াল কোত্থেকে এসে টেবিলের পায়াটা আঁচড়াতে লাগল। একটা না দুটো কুকুর রাস্তায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি সব স্বপ্ন-টপ্ন দেখে থাকবে, তারা হঠাৎ উ-হু-হু করে কেঁদে উঠল। একটা গাছ থেকে ঝটফট আওয়াজ হতে লাগল, দু চারটে পাখির ছানা ট্যাঁ ট্যাঁ করতে লাগল। আমার মনে হল ঐ যুবকরা বোধ হয় আমার মতলব টের পেয়ে গেছে। ওরা সব পুলিশের লোকও হতে পার। ওরা হয়তো জেনে গেছে আজ আমি রাহাজানি করতে বেরিয়েছি!

চা-ওলাকে বললাম, কত? চা-ওয়ালা বলল, পঁচিশ। আমি পকেট থেকে দু পয়সা বার করলাম বারোটা, তারপর দেখলাম আর দু পয়সা নেই, এক পয়সাও না। বাধ্য হয়ে তাই একটা সিকিই দিলাম তাকে। সে সিকিটা নিয়ে টুপ করে তার পকেটে রেখে দিল। আমি সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, এর পরের ট্রেনের কত দেরি? আমি যাদবপুর যাব।

চা-ওয়ালা বলল, এর পরের ট্রেন আসবার সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে ট্রেন আসতে পারে। আমি তখন

উলটো দিকের প্ল্যাটফরমের দিকে যাব এমন সময় ফোলা ফোলা বড়লোক বড়লোক চেহারার একজন এসে আমার কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, ভাই আমার গাড়িটাকে একটু ঠেলে দেবে, কিছুতেই স্টার্ট দিচ্ছে না!

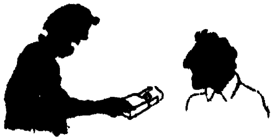
আমি বললাম, কত দেবেন?

লোকটা একথায় বেশ চমকে গেলেন মনে হল। আমতা আমতা করে বললেন, এই ধরুন দু টাকা? আমি উদাসীন ভাবে আকাশের দিকে তাকালাম। আমার ট্রেন এসে যাচ্ছে, আমার সময় নেই। আজ আমি রাহাজানি করব কিনা!

অথচ আমার এ কথা বলার ইচ্ছে ছিল না মোটে। অথচ কেমন যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। তখন ভাবলাম এ লোকটা আমাকে তো এখন হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে! আমি তখন তাকে ভয় দেখানর জন্য বললাম, কেটে পড়ুন দাদা—কালো দৈত্যের নাম শুনেছেন আশা করি? আমি তারই হাতের লোক। প্রতি রাত্রে তিনি একজনকে শেষ করেন।

লোকটি একথায় খুব হাসল, যেন খুব মজার কথা বলেছি আমি। কি আর করি—আমার কথা বিশ্বাস না করল ত ভারি বয়ে গেল। এর মধ্যেই একখানা ট্রেন এসে গেল, আর আমি টুপ করে একটা কামরায় উঠে পড়লাম। সেই কামরায় দেখলাম, আমি একা সেখানে, এবং সেই চারটে যুবক—উলটো দিক থেকে এসে ট্রেনে উঠল।

ট্রেন চলতেই একজন বলল, খুব কাপ্তেনী হচ্ছে দাদার—এবার যা আছে ঝটপট দিয়ে দিন তো? বলে আমার মুখ চেপে ধরে পকেট থেকে যথাসর্বস্ব নিয়ে নিল। সব সমেত দু টাকার উপর। সিগারেট, একটা পুরনো রুমাল, ছোরাটাকেও তারা রেহাই দিল না, এবং নিয়ে নিল যাদবপুরের টিকিটটাও। অনেক অনুনয় বিনয় করার পর ফতো কাপ্তান, শুয়োরের বাচ্চা ইত্যাদি সব অপমানজনক কথাবার্তা বলে তবে টিকিটটা ফেরত দিল, আর আমি কোনমতে যাদবপুরে নেমে শ্রীপদর ওখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারলাম। ভাগ্যিস টিকিটটা ফেরত দিয়েছিল, নইলে আমার কপালে সেদিন কি ছিল কে জানে?



পয়লা এপ্রিল যতই এগিয়ে আসে

পয়লা এপ্রিল যতই এগিয়ে আসতে থাকে, ততই হৃষীকেশ মানসিক ভাবে ঐ তারিখ থেকে পিছিয়ে যেতে থাকে। কেননা, সে কিছুতেই এগারো বছর আগেকার একটি ঘটনাকে মনে আনতে চায় না! আমরা যদি বলি—এই হৃষীকেশ, এবারে সুরঞ্জনকে একটু জব্দ করলে হয় না? কিংবা দ্বিজেনকে? হৃষীকেশ শুনে মোটেই উৎসাহিত হয় না। একটু বিমর্ষই হয়ে পড়ে যেন। আস্তে আস্তে বলে না ভাই ওসব ফরেন প্রথা আমাদের দেশ থেকে চলে যাওয়াই ভাল। সায়েব টায়েব যখন রাজা ছিল তখন মানাত; এখন আর নয়।

অথচ আমরা তো জানি, এগারো বছর আগে আমাদের দেশে সায়েব ছিল না, এমনি দু চারজনকে এদিক ওদিক দেখা যেত ঠিকই, এখন যেমন দেখা যায়, কেমন বিমর্ষভাবে চলতে চলতে মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকায়, তখনও তাই ছিল। তবে এখন যতবার তারা পেছন ফিরে তাকায় তখন ততবার তাকাত না। কিন্তু তখনো তারা রাজা ছিল না, কিন্তু হৃষীকেশ পয়লা এপ্রিল মানত ঠিকই। এখন সে যতই বলুক, পয়লা এপ্রিলে বোকা বানানো টানানো এসব ফরেন প্রথা. তখন কিন্তু এই হৃষীকেশ নানারকম প্যাঁচ মাথা থেকে বের করত। একবার কথা নেই বার্তা নেই, একত্রিশে মার্চ রাত্রিবেলা

একটা টেলিগ্রাম পাঠাল এক পোস্ট মাস্টারের নামে, গেট রেডি, মিস্টার টমাস রিচিং টুমরো। হৃষীকেশের ঐ এক আনন্দ—সম্পূর্ণ অচেনা পোস্টমাস্টার, সম্পূর্ণ অচেনা জায়গার, কিন্তু টেলিগ্রাম ঠিকই করে বসলো সে, আর এরপর কি হতে পারে এই ভেবে নিয়ে তার কি হাসি কি উল্লাস! পয়লা এপ্রিল সকাল থেকেই হৃষীকেশ ছটফট করত আর ভাবত—এই বার পোস্টমাস্টার মিস্টার টমাসের জন্ম টেবিল গোছাচ্ছেন। মুরগী নিশ্চয়ই কিনেছেন গোটা কয়েক। হয়ত তিনি নিজে নিরামিষাশী—বাড়িময় গোছ গাছ করছেন। হৈ হল্লা লাগিয়ে দিয়েছেন।

আর এক বছর মাধববাবু তো হার্টফেল করতে করতে বেঁচে গেলেন। মাধববাবু ভাল চাকরী করেন, উপরি আয় প্রচুর। একখানা সুন্দর বাড়ি করেছেন সম্প্রতি। গাড়িও কিনেছেন। বেশ সুখে শান্তিতে আছেন। হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির—সময় থাকতে থাকতে কেটে পড়, কতৃপক্ষ সবই জেনে ফেলেছে! ঐ টেলিগ্রাম পেয়েই মাধববাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সারতে লাগল কয়েক মাস। অবশ্য পরে তিনি খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন কর্তৃপক্ষ কিছুই জানেন না, তবে তিনি আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শক্তি পেলেন আবার তাঁর উপরি আয় হতে লাগল।

এরকম অনেক ঘটনা। কখনো টেলিগ্রাম, কখনো এমনি কোনো গুজব রটানো। আমাদের বন্ধু বীরেশ্বর তখন এম এ পাশ করে আমাদেরই মত চাকরী খুঁজছে আর কফি হাউসে বসে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে—পরের কাপ কফির দাম কে দিতে পারে, আর ভাবছে কেমন করে সুদীপ্তার বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের কথাটা বলা যায়। অবশ্য আমরা চাকরী খুঁজতাম ঠিকই আর খুঁজতাম কফির দাম দেবার মত কাউকে কিন্তু আমরা সকলে সুদীপ্তার বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের কথাটা বলবার কথা ভাবতাম না। আমাদের মধ্যে, যতদূর জানি জন পাঁচেকের বেশি এই শেষের কথাটা ভাবতাম না। এই পাঁচজনের মধ্যে হৃষীকেশও ছিল।

একদিন বোধহয় সুদীপ্তার সঙ্গে বীরেশ্বরকে হৃষীকেশ কোথায় দেখেছে। সেদিন হৃষীকেশ কি রকম মনমরা হয়ে রইল। তারপর আমার কাছে তার মনের খবরটা প্রকাশ করল। বলল, এই পয়লা এপ্রিলে বীরেশ্বরের জন্য একটা দারুণ প্যাঁচ খেলেছি আমি। এমন ব্যাপার করব যাতে ওর বারোটা বেজে যাবে। আমি বললাম, একদম বারোটা বাজালে আমাদের সর্বনাশ হবে না? মনে পড়ল, বিভিন্ন সময়ে বীরেশ্বর আমার কাছ থেকে শার্ট, মোজা ধার নিয়েছে তা ছাড়া টেকসট বুক বিক্রী করেও ওকে ধার দিয়েছি, কতবার অন্যদের কাছ থেকেও নিয়েছে। এসব ধার একদিন সে শোধ করবে সে আশা ক্ষীণ হলেও' আছে। কিন্তু তার বারোটা বেজে গেলে সে আশা কি থাকবে? এমনিতে কারুর বারোটা বাজলে ক্ষতি নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যদের জড়ালেই অসুবিধে হয়।

আমি তাই বললাম, একেবারে?

হৃষীকেশ আমার কথার জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করল না। হাসতে হাসতে বলল, আমি সংবাদ পেয়েছি বীরেশ্বর চাকরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিল্লিতে বোমবাইতে মাদ্রাজে যখানেই বিজ্ঞাপন দেখছে সেখানেই চিঠি ছাড়ছে।

একথায় আমি হাসতে পারলাম না। গত কয়েক মাসের মধ্যে আমিও কম চিঠি লিখিনি। গম্ভীর ভাবে বললাম, তাতে হয়েছে কি? চাকরী দরকার তাই চিঠি পাঠাচ্ছে।

হৃষীকেশ বলল, ওর চাকরীর একটু বেশি দরকার হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। আমি একবার গুল মেরে বলেছিলাম, দিল্লিতে আমার মামা একজন এম পি, তার অগাধ ক্ষমতা—যাকে তাকে যখন তখন চাকরী দিতে পারেন। কবে বলেছিলাম আমিই ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু গত কয়েকদিন যাবৎ আমাকে ও কেবলি খোঁচাচ্ছিল ঐ এম পি মামাকে একটা চিঠি লিখে দিতে। অথচ যমন একটা এম পি মামা থাকলে আমি এরকম ফ্যা ফ্যা করে কন ঘুরে বেড়াচ্ছি এ খেয়ালটা ওর হল না।

আমি বললাম, তা তুমি কি করলে; বলে দিলে তুমি গুল মেরেছিলে?

হৃষীকেশ হিক হিক করে খানিকক্ষণ হেসে বলল, না। তা ছাড়া তা বললে ও বিশ্বাস করত নাকি? ছু একবার বলিনি তাও নয়। ও কেবলি বলছে, ও তার এক আত্মীয় বাড়িতে কাকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে, এই সুযোগে সে আমার এম পি মামার সঙ্গে দেখা করতে চায়—অতএব একটা চিঠি চাই।

আমি বললাম, তা তুমি কি করলে?

হৃষীকেশ এবার ফ্যা ফ্যা করে হাসল। বলল, আমি আর কি বলব—লিখলাম প্রিয় দামু মামা!

—দামুমামা কে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হৃষীকেশ বলল, দামু মামা আমার মাথা খাটিয়ে বার করা, এমন কোন ব্যক্তি এম পি আছেন বলে আমার জানা নেই। আসলে...। হৃষীকেশ তখন একজন হোমরাচোমরা ব্যক্তির নাম করে বলল, আসলে আমি বীরেশ্বরকে বলেছি ওঁরই নাম দামু মামা। বাড়ির ডাক নাম। তাতে বীরেশ্বর আরো খুশী হয়েছে।

আমি বললাম, তা ঐ এম পি মামার ঠিকানা কোত্থেকে যোগাড় করলে?

হৃষীকেশ বলল, ঠিকানা যোগাড় করিনি। বলেছি, আগের ঠিকানা বদলেছেন তিনি—অতএব টেলিফোন ডাইরেকটরি থেকে দেখে নিতে। তারপর হৃষীকেশ, খুব যেন একটা মজার কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে এই মনে করে হুয়া হুয়া করে হেসে উঠল। হঠাৎ দূর থেকে শুনলে মনে হবে শেয়াল, কিন্তু তা নয়। হৃষীকেশ নানারকম হাসত, তার এক রকমের হাসি ছিল শেয়াল হাসি।

আমি বললাম, এ তুমি ঠিক করনি হৃষীকেশ। হৃষীকেশ বলল, যুদ্ধ, প্রেম, মজা, আনন্দ এসবের মধ্যে কোনরকম কিন্তু কিন্তু আনা উচিত নয় বুঝেছ? একজনকে যদি নির্মলভাবে ঠকিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় তাতে কার আপত্তি থাকতে পারে?

আমি বললাম, নির্মলভাবে ?

হৃষীকেশ বলল, খুব নির্মল হয়ত নয়। এম পিরা শুনেছি খুব বদরাগী হন। তা ছাড়া তাদের গেটে কুকুর থাকে।

—কুকুর ? আমি অবাক হলাম।

কুকুর আর দারোয়ান। এম পি হবার তো ঐ মজা। সরকার কত টাকা অ্যালাউয়েনস দেয় তাদের। তার উপর যদি ছোট খাট মন্ত্রী হন তবে তো কথাই নেই। বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ফ্রিজ বিমানভ্রমণ গেস্ট সবই তখন ভারতের জনগণের ট্যাকের পয়সায় চলে।

আমি শঙ্কিত হয়ে বললাম, তোমার ঐ এম পি মামা, দামু মামা যার নাম দিয়েছ, তার কি কুকুর টুকুর আছে ?

হৃষীকেশ বলল, কে জানে আছে কিনা। থাকাই তো সম্ভব। কুকুররা তো আর বোঝে না কে এম পি কে এম পি নয়—অতএব তারাও কেটে পড়ে না। আর কেটে পড়বেই বা কেন ?

আমি বললাম, কেটে পড়বে তা তো আমি বলিনি।

হৃষীকেশ আমার কথা শুনেছে বলেই মনে হল না। সে বলল, মানুষেই কেটে পড়ে না কুকুর কাটবে কি দুঃখে ?

আমার রাগ হল, আমি বললাম, কুকুর কেটে পড়বে আমি বলিনি তো—খামোখা তুমি কুকুর সম্বন্ধে বক্তৃতা মারছ কেন, ব্যাপার কি ?

হৃষীকেশ বলল, কুকুর কেটে পড়বে তা তুমি বলনি ঠিকই কিন্তু কুকুরের কথা বলেছ সেই থেকেই কথাগুলো আমার মনে উদয় হল।

আমি বললাম, তা বীরেশ্বরের পেছনে কুকুর ধাওয়া করে আসুক আর ঐ বিদেশে বিভূঁয়ে বাঙালী হয়ে ল্যাজ মাথায় করে দৌড়োনো কি ভাল দেখাবে ?

হৃষীকেশ বলল, বাঙালীরা দেশে যখন ল্যাজ মাথায় করে পালায় তখন তো দেখি তোমরা রা কাড়ো না। বাইরে একটু ইয়ে হলেই যত গোল অ্যাঁ ?

আমি বললাম চুপ। এমন পলিটিক্যাল তক্কোটক্কো চালিও না। আমি ভাবছি তোমার কোনো সেন্স নেই। নইলে একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে ওভাবে বিপদে ফেলতে কেউ পারে?

হৃষীকেশ তখন খুব অমায়িক ভাবে হেসে বলেছিল, আরে ব্যাপারটা ঘটবে পয়লা এপ্রিল। ঐ দিনে একটু জব্দ টব্দ করতে হয় নইলে কেমন যেন ইয়ে ইয়ে লাগে।

তারপর অনেকক্ষণ আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করল, তার কথায় আমার মুখের রেখা বদলাচ্ছে কিনা। যখন দেখল তেমন বদলাচ্ছে না, তখন সে বলল, সিগ্রেট হবে একটা?

কিন্তু সবচেয়ে ঘোর আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল ঐ পয়লা এপ্রিলেই। আমরা সেটা জানতে পারলাম উনিশে এপ্রিল, যেদিন বীরেশ্বর দিল্লি থেকে ফিরে এল। প্রথমে আমার সঙ্গেই দেখা হল কফি হাউসের কোণের দিকে। দেখলাম, বীরেশ্বর লাফিয়ে লাফিয়ে অনেকটা প্রজাপতির মত হালকা ভাবে আসছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে এসে আমার পাশে বসে পড়ল। কিছু খাচ্ছ না? আমার শূণ্য টেবিল দেখে প্রশ্ন করল। আমার বীরেশ্বরকে দেখে একটু রাগই হল। দিল্লি থেকে এপ্রিলফুল হয়ে এসেছে সেজন্য একটু রাগ রাগ মুখ করে থাকবে তো? কিচ্ছু না যেন খুশীতে সে উপছে পড়ছে।

আমি একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম লাগল দিল্লি? ওর যে হৃষীকেশের এম পি মামার কাছে যাবার কথা তা যেন আমি একদম জানি না এমন ভান করলাম।

—দিল্লি? বীরেশ্বর উত্তেজিত হয়ে উঠল, ওটা একটা জায়গা নাকি? টেরিবল জায়গা—তাছাড়া যা গরম, কোনো মানুষ থাকতে পারে না ওখানে।

আমি বললাম, কি করে যে ওখানে এম পি-রা থাকে সেটাই আশ্চর্য।

বীরেশ্বর বলল, এম পিরা বেশ ভালই থাকে দেখলাম। ভাল কথা, হৃষীকেশকে দেখেছ?

আমি বললাম, আসবে একটু পরেই, যাবে কোথায়, কেন?

বীরেশ্বর বলল, ওকে পেলে…

আমি বললাম, থাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। ও যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আর কিছু বলো না ওকে। আমি কিছু কিছু শুনেছি। ওকে পেলে তুমি ওকে ছিঁড়ে ফেলবে তা আমি অনুমান করছি। কিন্তু জানই তো বিলেতে পয়লা এপ্রিল বলে একটা প্রথা আছে? অল ফুলস ডে? হৃষীকেশ তোমাকে একটু জব্দই করতে চেয়েছিল, জানই তো ওর স্বভাব।

—তুমি কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না? বীরেশ্বর বলল। তারপর পকেট থেকে সুন্দর এক প্যাকেট সিগারেট বার করল। তাতে কুড়িটা সিগারেট থাকে। বীরেশ্বর প্যাকেটটা খুলতেই দেখলাম তার মধ্যে আঠারোটা আছে। দেখে আমার জিভে জল এল।

আমি বললাম, তোমাকে কুকুরে তাড়া করেনি দিল্লিতে?

—না। বীরেশ্বর আরো অবাক হয়ে তাকাল।

—বা এম পি? কিংবা দারোয়ান?

—না!

আমি বললাম, কি হল?

বীরেশ্বর বলল, কিসের কি হল?

—তুমি পয়লা এপ্রিল এক এম পির বাড়িতে গিয়েছিলে কিনা। আমি প্রশ্ন করলাম।

—তা গিয়েছিলাম ত! দারুণ লোক তিনি সত্যি। হৃষীকেশ অবশ্য লিখেছিল চিঠিতে দামু মামা। তা তাঁর নাম দামু নয়, কস্মিনকালেও ছিল না। যাই হোক আমি তাঁকে একটা চিঠি দিলাম, চিঠিতে হৃষীকেশ…।

আমি বললাম, চিঠিতে যা লেখা ছিল তা আমি জানি, তারপর কি হল বল ?

বীরেশ্বর বলল, তিনি অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটা পড়লেন। তারপর ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন। তারপর একটু মৃদু হাসলেন। আমার যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন কোলকাতায় একটা কি দফতর হবে সেখানে তাঁর আমারই মত একজনের প্রয়োজন আছে। কত টাকা মাইনে হলে চাকরী করতে রাজি আছি জিজ্ঞেস করায় আমি বললাম, ছশো টাকা মাসিক, তার কমে আজকালকার বাজারে···ইত্যাদি। তা তিনি বললেন, না আমি খুব বেশি চাইছি না—তারপর একজন সেক্রেটারিকে কি যেন বললেন। সেক্রেটারি আমাকে নিয়ে একটা অফিস ঘরে একটা ফর্ম দিলেন। সেই ফর্ম পূরণ করলাম বসে বসে। নাম ঠিকানা ইত্যাদি। তারপর সেক্রেটারি আমাকে বললেন দিল্লিতে আরো দিন পনেরো থাকতে। আমি বললাম, নিশ্চয়ই। তখন সেক্রেটারি বললেন, চাকরী হলে কিন্তু খাওয়াতে হবে ?

কিন্তু, বীরেশ্বর বলতে লাগল, অথচ খাওয়ালেন তিনিই। দুটো বড় বড় সিঙ্গাড়া, দুটো সন্দেশ আর দই-এর সরবত। ফার্সট ক্লাস !

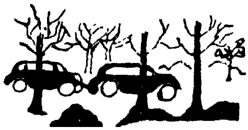
আমি বললাম, তারপর ?

বীরেশ্বর বলল, তারপর সবই স্বপ্নের মত। তিনবার ইনটারভিউ হল আমার, বিভিন্ন লোকের সামনে হাজিরা দিতে হল। শেষ দিনে পেয়েও গেলাম চাকরীর চিঠি। তবে একটি আশ্চর্য ব্যাপার— হৃষীকেশ নামটা কিন্তু এম পি কখনো শুনেছেন বলে মনে হল না। বললেন, ঠিক চিনতে পারছি না তাকে। দূর সম্পর্কের কেউ হবে কে জানে।

আমার হৃৎপিণ্ডটা কেমন যেন দুমড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল। এটা ঠিক ঈর্ষা নয়। কেমন যেন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব। বেদনা ভর্তি ফাঁকা একটা ভাব—অনেক কবির লেখায় ঠিক যেমনটি দেখতে পাই।

তবু মনে মনে এই ভেবে খুশী হয়ে উঠলাম যে, আমার চাইতেও একশো গুণ বেশি ফাঁকা ফাঁকা লাগবে আর বেদনায় ভরে উঠবে হৃষীকেশের বুক।

ঐ ঘটনার পর থেকেই এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখ যতই এগিয়ে আসে ততই হৃষীকেশ কেমন যেন হয়ে যায়।



রাঁচী থেকে ধানবাদ

একটি গাড়ি থেমে ছিল রাস্তার ধারে—আর দুটি লোক হাত নাড়ছিল। প্রবীর সম্প্রতি বিলেত থেকে এসেছে, তাই সে ব্যাপারটা তক্ষুনি বুঝতে পারল। সে বলল, বুঝলে—এরা বিপদে পড়েছে কিনা তাই হাত নাড়ছে। ব্যাপারটা আমিও বুঝেছিলাম, কিন্তু বিলেত থেকে ঘুরে না আসার দরুন ঠিক সাহস করে বলতে পারছিলাম না। প্রবীর বলাতে সাহস হল, বললাম বোধ হয় গাড়ি খারাপ হয়েছে। আজকালকার যা গাড়ি হয়েছে সব এক একখানা। প্রবীর বলল, গাড়ি খারাপ হোক তাতে ক্ষতি নেই—দিশী গাড়ি যে আজই বিলিতি গাড়ির মত হবে তা আশা করাটাই অন্যায়, কিন্তু ভদ্রতা? রাস্তায় যারা গাড়ি চালায় তাদের ভদ্রতা বলে কোনো বালাই নেই।

রাঁচী থেকে ধানবাদ যাচ্ছিলাম শনিবারের বিকেলে, প্রবীরের গাড়িতে। সঙ্গে হৃষীকেশও রয়েছে। প্রবীর আর হৃষীকেশ রাঁচীতে মাস দু এক হল আছে—আমি পাঁচ দিন ছুটি নিয়ে এসেছি ওদের নিমন্ত্রণে। ওদের সঙ্গেই ঘুরছি বেড়াচ্ছি। মাঝে মাঝে প্রবীরের বিলিতি কাহিনী শুনছি। মাঝে মাঝেই প্রবীর ওদেশেরে সঙ্গে এদেশের তুলনা করছে। তুলনা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। তবে দেখলাম বিলিতি ভদ্রতাই ওকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে। সে বলেছে, দেশের অধিকাংশ মানুষ কেমন করে অত ভদ্র হয় আমি ভাবতে পারি

না। এই ভদ্রতার গল্প করতে করতে আর গাড়ি চালাতে ভদ্রতা করতে করতে প্রতি ঘণ্টায় আমাদের বেশ কয়েক মিনিট সময় নষ্ট হচ্ছিল। জিব্রা ক্রসিং-এ প্রবীর অহেতুক গাড়ির গতি কমাচ্ছিল, রাস্তায় কোনো বুড়ো বা বুড়িকে পার হবার চেষ্টা করতে দেখলে গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে প্রায় হাত ধরে রাস্তা পার করে দিয়ে আসছিল।

প্রবীর গাড়ি থামিয়ে হাত নাড়া লোকদুটিকে বলল, আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। দেখেই বুঝতে পারছি আপনারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর কেউ আপনাদের সাহায্য করবার জন্য গাড়ি থামায়নি। আপনারা এক কাজ করুন—নিশ্চিন্ত মনে গাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি সব ব্যবস্থা করছি। লোক দুটি বলল, গাড়িতে গিয়ে বসব? প্রবীর বলল, আপনাদের কিচ্ছু করতে হবে না, কেবল গাড়িতে বসে থাকুন তাহলেই হবে।

লোক দুটি প্রবীরের কথায় আস্তে আস্তে গিয়ে গাড়িতে বসল। প্রবীর এবারে আমাদের গাড়িটিকে নিয়ে সামনে চলে গেল, তারপর গাড়ি থেকে নেমে জিনিসপত্র রাখবার জায়গা থেকে বেশ মোটা দড়ি বার করল। তারপর দুটি গাড়িকে এক দড়িতে বাঁধল। খুব ভাল করে বেঁধে সে পিছনের গাড়ির লোকদের বলল, এবারে বলুন কোথায় যাবেন, আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। লোক দুটি কি যেন বলল—প্রবীর এসে গাড়ির হুইল ধরে বলল, লোক দুটি একটি কম্পানির বিশেষ মিটিং-এ আসানসোলে যাচ্ছে। দেখ দিকি আমি যদি না থামাতাম তাহলে ওদের অবস্থা কি হত? আমরা ওদের ধানবাদ পর্যন্ত পৌঁছে দেব। ধানবাদ থেকে একটা ট্যাক্সি করে ওরা ঠিক সময়ে আসানসোলে পৌঁছে যাবে।

আমি বললাম, কিন্তু আমাদের তো দেরি হয়ে গেল, মানে আমরা যে ধানবাদে সিনেমা দেখবার কথা বলেছিলাম সেটা তো আর হবে না। প্রবীর বলল, দেখ ভাই বেণীমাধব—দুটি লোক এমনভাবে রাস্তায় পড়ে থাকবে আর আমরা সামান্য সিনেমা দেখার লোভ ত্যাগ করতে পারব না? সিনেমা কি পৃথিবীতে আর হবে না নাকি কোথাও?

হৃষীকেশ বলল, না ঠিক তা বলছি না। ব্যাপার-হচ্ছে কি, লোকদের সাহায্য করার মত ভাল কাজ আর কি হতে পারে। কিন্তু এর তো একটা মাত্রা থাকা উচিত। মানে, এরকম বিপদে ভারতবর্ষে আরো হাজার হাজার লোক পড়ে আছে। তাদের প্রত্যেককে যদি সাহায্য করতে হয় তাহলে তোমার নিজস্ব সময় বলে কিছু থাকবে না।

প্রবীর বলল, আমাদের জল হাওয়া বোধহয় মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। মানুষকে সাহায্য করাটাও মানুষের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে। আমি বলছি না যে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে আমাদের বিপদগ্রস্ত লোককে খুঁজে বার করে তাদের সাহায্য করতে হবে। আমরা যাচ্ছি ধানবাদে—তারা যাচ্ছে আসানসোলে। আমরা যদি সামান্য কষ্ট স্বীকার করে তাদের একটা গুরুতর উপকার করতে পারি তাহলে করব না কেন? একটা গল্প বলি শোনো। ঠিক গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। মাস ছয়েক আগেকার কথা, আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডে বেড়াচ্ছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে ফাইফ-এর কেলটি শহরে আসবার আগে হঠাৎ আমাদের গাড়ির টায়ার একটি ফেটে গেল।

আমি বললাম, বিলিতি গাড়ির টায়ার ফেটে গেল?

প্রবীর বলল, ফেটে গেল। তাড়াতাড়ি গাড়িটিকে তো সামলানো গেল, নইলে প্রায় দুশো ফুট গড়িয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়তে হত। জায়গাটি একেবারে জনমানবশূন্য। বিকেল হয়ে গিয়েছে—একটু পরেই গাঢ় অন্ধকার আমাদের ঘিরে ধরবে। আমাদের কাছে একটি যে আলাদা টায়ার থাকবে তাও নেই। অবস্থা বোঝ—কাছে একটু খাদ্য নেই, ধারে কাছে কোনো মানুষ নেই।

হৃষীকেশ বলল, ইতিমধ্যে একটি গাড়ি থামলো—তা থেকে একটি সায়েব বেরিয়ে এলো, এসে তোমাদের গাড়িটিকে টেনে নিয়ে গেল এই তো?

প্রবীর বলল, ঠিক। কখনো দেখবে না একটি সায়েব কারুর বিপদ দেখে চুপ করে বসে থেকেছে। এটা একটা মহৎ চরিত্রের

চিহ্ন। এই চরিত্র আমাদের নেই। আমাদের দেশের শতকরা আটানব্বুই জনেরই নেই।

আমি বললাম, শতকরা অটানব্বুই জনের গাড়িও নেই যে। গাড়ি থাকলে তবে তো অমন চরিত্র হবে!

আমরা বিকেল হয়ে আসা রাঁচী-ধানবাদের রাস্তা দিয়ে চলেছি। একটু আস্তে আস্তেই চালাতে হচ্ছে গাড়িটা, কেননা পথের অবস্থা তেমন ভাল নয়। তা ছাড়া পিছনের গাড়িটিকে নিয়ে জোরে চালানোও খুব নিরাপদ নয়।

হঠাৎ পিঁপ পিঁপ করে আওয়াজ হল পিছন থেকে। প্রবীর তক্ষুনি গাড়ি থামিয়ে ফেলে বলল, পিছনের গাড়ির লোকেরা কিছু চাইছে বলে মনে হচ্ছে।

ঝট করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল প্রবীর।

মিনিট খানেক পরে এসে দরজা খুলে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে চলে গেল। তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আবার ফিরে এল। প্রবীর এসে আবার গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, বেচারা—তাদের কাছে একটি সিগারেটও নেই। দিয়ে এলাম চারটে।

খানিক পরে দেখলাম, আমার মধ্যেও ভদ্রতা বোধ জাগছে। আমি বললাম, আমাদের ফ্ল্যাস্কে যে কফী রয়েছে তা একটু অফার করলে হত না? তা শুনে হৃষীকেশও খুব উৎসাহের সঙ্গে সায় দিয়ে উঠল। প্রবীর বলল, ঠিক বলেছ—ওরা নিশ্চয় তৃষ্ণার্ত হয়েছে। কেবল তাই নয়—আমাদের খাবার জন্য যে স্যাণ্ডউইচগুলি কিনে এনেছিলাম সেগুলিও বোধ হয় ওদের ভাল লাগবে।

প্রবীর গাড়ি থামিয়ে আবার গেল। গিয়ে ফিরে এল। ফিরে এসে স্যাণ্ডউইচের প্যাকেটটি নিয়ে চলে গেল। ফ্ল্যাস্কটিও সঙ্গে নিয়ে গেল, তারপর মিনিট দশেক পর ফিরে এল। ফিরে এসে বলল, খুব তৃপ্তি করে খেল ওরা। দেখে বড় আনন্দ হল। বাই দি ওয়ে, হৃষীকেশ তোমার কাছে সিগার আছে না কটা?

হৃষীকেশ বিমর্ষভাবে তার জ্যাকেটের পকেট থেকে ছুটো সিগার

বার করে প্রবীরের হাতে দিল। প্রবীর এক মিনিটের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল! আবার ফিরে এল, এসে আবার গাড়ি চালাতে শুরু করল। চালাতে চালাতে প্রবীর শিস দিতে লাগল। তারপর শিস দেওয়া থামিয়ে বলতে লাগল, ভদ্রতা ব্যাপারটা খুব সংক্রামক। আজ ওদের যে ভদ্রতা আমরা করলাম, ওরাও নিশ্চয় পরে অন্য কারুর বিপদে ঠিক এমনি ভদ্রতাই করবে। তারপর দেশে ভদ্রতার একটা বন্যা এসে যাবে। স্নো বল জানো তো—প্রথমটা থাকে এইটুকু একটা টেনিস বলের মত, তারপর সেটা পাহাড় থেকে গড়াতে থাকে। যত গড়ায় তত তার সঙ্গে আরো স্নো লেগে যায়। আরো বড় হতে থাকে, হতে হতে প্রকাণ্ড বড় হয়। হৃষীকেশ বলল তারপর সেটা কোনো গ্রামের মধ্যে গিয়ে পড়ে তো বাড়ি ঘর ভেঙে পড়ে।

প্রবীর বলল, বাড়ি ঘর ভেঙে পড়ার কথা হচ্ছে না। বলছিলাম আজ যে ভদ্রতা আমি শুরু করলাম সেই ভদ্রতা এখানেই থেমে থাকল না। এরপর সংক্রামক রোগের মত……

বলতে বলতে প্রবীর কি ভেবে বলল, না উপমাটা বোধহয় ঠিক হল না। কচুরিপানার সঙ্গে যে তুলনা করব তাও ঠিক মনে লাগছে না।

আমি বললাম, তুলনা করবার দরকার কি, সোজাসুজি বললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

প্রবীর বলল, আমি সোজাসুজিই বলছি আমাদের এই ভদ্রতা হবে মরুভূমিতে মরুদ্যানের মত। একটা তৃপ্তির ভাব নিয়ে এরা বাড়ি যাবে। গিয়ে ভাববে। ভাবতে ভাবতে তারা আরো ভদ্রতা করবে— তারপর তাদের কাছে অন্য লোকেরা ভদ্রতা শিখবে। অর্থাৎ কিনা দেশে বছরখানেকের মধ্যে ভদ্রতার বান ডাকবে। লোকেরা তখন বিপদে পড়লে তেমন আতঙ্কিত হবে না। অনেকে আবার খুশীর সঙ্গে বিপদে পড়বে—সেই দিন হবে ভারতবর্ষের নবজন্ম, নবজাগরণ।

আবার পিঁপ পিঁপ আওয়াজ। প্রবীর আবার গাড়ি থামালো— তার নবজাগরণ সম্পর্কীয় বক্তৃতা বোধহয় তখনো শেষ হয়নি, কিন্তু তা

সত্ত্বেও সে বেশ হাসি মুখে পিছনে গেল, হাসি মুখেই সে আবার ফিরে এল। আমি বললাম, এবারে কি ব্যাপার? প্রবীর বলল, ব্যাপার কিছুই নয়—পিছনের লোক দুটি তর্ক করছে। একজন বলছে ব্যাঙ সাপ খায়, আর একজন বলছে না তা ঠিক নয়, সাপেই ব্যাঙ খায়। তর্কের মীমাংসা করে এলাম।

হৃষীকেশ বলল, তুমি কিভাবে মীমাংসা করে এলে?

প্রবীর বলল, আমি বলে এলাম ওরা দুজনেই ঠিক। কোনো কোনো জাতের বড় বড় ব্যাঙ কোনো কোনো জাতের ছোট ছোট সাপ খায়। ভাগ্যিস ব্যাপারটা আমার জানা ছিল!

বলতে না বলতে আবার পিঁপ পিঁপ আওয়াজ। প্রবীর গাড়ি থামিয়ে আবার ঘুরে এসে বলল, আমাদের টর্চলাইটটা কোথায়?

আমি বললাম, টর্চলাইটে কি হবে?

প্রবীর বলল, ওরা এখন কি একটা হাসির গল্পের বই পড়বে, কিন্তু আলো নেই।

হৃষীকেশ বলল, বলো না যে আমাদের টর্চলাইট নেই। আর একটা কথাও তাঁর সঙ্গে জিজ্ঞেস করে এসো।

প্রবীর বলল, আর কি কথা?

হৃষীকেশ বলল, আর জিজ্ঞেস করে এসো তারা ভদ্রলোক কিনা।

প্রবীর বলল, কি যা-তা বলছ হৃষীকেশ। ওরা নিশ্চয় ভদ্রলোক-ওদের গাড়ী রয়েছে, ওদের একজনের আবার চশমা রয়েছে। তা ছাড়া আমরা যা করছি তার জন্য তারা কতবার ধন্যবাদ দিচ্ছে। ভদ্রলোক কিনা জিজ্ঞেস করবার কোনো দরকার নেই—দেখলেই বোঝা যায় তারা ভদ্রলোক। বলতে বলতে সীটের উপর রাখা হাতব্যাগ থেকে একটা টর্চ বার করে প্রবীর তাদের দিয়ে এল। আমরা তারপর খুব হ্যা হ্যা হাসির আওয়াজ পেলাম, তাতে ধরে নিলাম তারা হাসির গল্পের বইটা পড়তে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।

এইভাবে, তিন ঘণ্টার পথ পাঁচ ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম। ইতিমধ্যে আরো অবশ্য বার নয়েক রাস্তায় গাড়ি থামাতে হয়েছে, আর

প্রতিবারই একটা না একটা ভদ্রতা করে এসেছে প্রবীর। ভদ্রতা করাটা সংক্রামক বলে আমাদেরও মাঝে মাঝে ভদ্রতা করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু প্রবীর তাতে খুব খুশী নয়। সে নিজেই ভদ্রতা করে একটা উদাহরণ স্থাপন করবে বলায় আমরাও নিমরাজী হয়ে গেলাম।

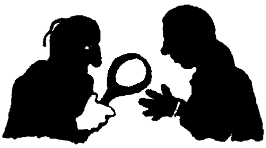
ধানবাদ রেল স্টেশনে পৌঁছে আমরা সবাই নামলাম। পিছনের গাড়ির লোকেরাও এলো। আমরা খুব হৃদ্যতার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম। তারাও খুব ধন্যবাদ দিতে লাগল আমাদের। তারা আমাদের ফ্লাস্ক এবং টর্চ ফেরত দিল, আমরা ধন্যবাদ দিলাম। প্রবীর বলল, এবারে একটা ট্যাকসি ঠিক করে দিই? গাড়িটা এখানেই থাক, আমরা এটাকে সারিয়ে রেখে দেব।

এরপর অন্য গাড়ির দুজন প্রথমে আমাদের গাড়ির সঙ্গে তাদের গাড়ির বন্ধন মুক্ত করল। দড়িটা গুটিয়ে আমাদের ফেরত দিল। তারপর গাড়িতে গিয়ে বসে স্টার্ট দিল। আমরা তো অবাক—যে গাড়ি চলছিল না সেটাকে স্টার্ট নিতে দেখে প্রবীরও অবাক।

প্রবীর বলল, গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে যে?

অন্য গাড়ির একজন বলল, গাড়ি স্টার্ট নেবে না কেন? চালু গাড়ি এটা—গাড়ি তো খারাপ হয়নি আমাদের! আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করছিলাম আর তর্ক করতে করতে হাত পা নাড়ছিলাম, তাই দেখে আপনারা ভদ্রতা করতে এলেন, আর ভদ্রতায় বাধা দিয়ে আপনাদের অসম্মান করতে বাধল আমাদের।

অন্য লোকটি এবার বলল, তবে ধন্যবাদ আপনাদের প্রাপ্য। আমাদের প্রায় ষোল টাকার পেট্রোল বেঁচে গেল কিনা।



হাত দেখে যতটুকু বলা যায়

'মাস দুয়েক আপনার সময় খুব খারাপ গেছে, গেছে কিনা বলুন?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যোতিষী।

জ্যোতিষীর সামনে একজন মহিলা। মৃদু আলোয় ঘরটা রহস্যময়। যদিও এখন দিন শেষ হয়নি, বিকেল চারটে বাজে, তবু এখন আলো জ্বলছে। ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করার ঘরে সব সময়েই আলো জ্বলে সেটাই জ্যোতিষী মশাই-এর দস্তুর।

'গেছে। প্রচণ্ড সময় খারাপ গেছে। ঠিক বলেছেন। তবে বছর তিনেক থেকেই আমার সময় খারাপ যাচ্ছে।' বললেন মহিলাটি। মহিলাটি যদিও অল্প আলোয় বসেছিলেন, তাঁর কররেখা দেখবার সময় জ্যোতিষী মশাই একটা ছোট টেবিল ল্যাম্প ব্যবহার করছিলেন, তাই কররেখাগুলি স্পষ্টভাবে নজরে পড়ছিল। তিনি প্রথমেই মহিলাটিকে দেখে নিয়েছিলেন ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই। ছিপছিপে লম্বা—বছর চব্বিশ কি পঁচিশ হবে, কিছু কম বেশিও হতে পারে। ফোলানো ফাঁপানো চুল। হাতে, গলায় কোনো গয়না নেই, একটা ঘড়িও নয়। হালকা রঙের একটা শাড়ি পেঁচিয়ে তাঁকে মোহময়ী করে তুলেছে। ঐ কম আলোতেও চোখে পড়ে বড় বড় আশাপূর্ণ চোখ দুটি।

'থাকবে না। খারাপ সময় থাকবে না।' জ্যোতিষী বললেন।

'থাকবে না?' মহিলাটির হালকা গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। মনে হল তিনি যেন হাঁপ ছাড়লেন। 'আর পারছি না। আর পারছি না।'

'পারবেন। এমন কিছু নয় আপনার ব্যাপারটা। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'পারব?'

'আলবাত পারবেন। আপনার কুষ্ঠি ইত্যাদি পাঠিয়ে দেবেন—সেই অনুযায়ী আমি একটা মাদুলি করিয়ে দেব। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হাত দেখে আপনি এর বেশি কিছু বলতে পারবেন না?'

'পারি বৈকি। তাতে সবটা ঠিক মেলে না। মেলান যায় না। হাতের রেখা বদলাতে থাকে। আজ এদিকে বদলাচ্ছে কাল অন্য দিকে। তবে মোটামুটি বলা যায়।'

'বলুন, যা বলা যায়।'

'আমি দেখতে পাচ্ছি,' জ্যোতিষী একটু ধ্যানমগ্ন হলেন। তিনি কি সব দেখতে পেলেন মানস চখে বলে মনে হল। 'আমি দেখতে পাচ্ছি উজ্জ্বল দিন। লম্বা একটি পুরুষ। ছ' ফুট লম্বা। সরু গোঁফের রেখা, উজ্জ্বল গায়ের রং। পরনে বিদেশী পোশাক, লোকটি ভারতীয়।'

'ঠিক দেখতে পাচ্ছেন?'

'স্পষ্ট। তার চুল ছোট করে ছাঁটা। বয়স ত্রিশের কিছু কম। হাতে সোনার ঘড়ি, পকেটে সোনার ফাউন্টেন পেন, হাতে সোনার লাঠি...।'

'সোনার লাঠি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সোনার লাঠি।'

'আর কি দেখছেন?'

'দেখছি তার শক্তি—প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী সে। আমি দেখতে

পাচ্ছি, বাগানওলা, টেনিস কোর্টওলা একটা শান্তিময় বাড়ি। বাড়িতে পিয়ানো, বেহালা। ছোট্ট পুকুরে রাজহাঁস। গ্যারেজে গাড়ি।'

'কি গাড়ি বোঝা যায়?'

'অতটা বোঝা যায় না। তবে সাধারণ গাড়ি নয়। ঝকঝক করছে রং, চকচক করছে কাঁচ। গাড়িটা এয়ার-কনডিশান করা।'

'এয়ার কনডিশান করা গাড়ি?'

'তাইতো মনে হচ্ছে। দাঁড়ান ভাল করে দেখি।...হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি এয়ার-কনডিশান করা একটা দামী বিদেশী গাড়ি।'

'ওঃ কি অদ্ভুত! আমার স্বপ্নের সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে।'

'স্বপ্নও সত্য হয়। যেমন কিনা সত্যও স্বপ্ন হয়ে থাকে।'

'আপনি অদ্ভুত!'

'আমি তো দর্শক মাত্র, আমাদের অদ্ভুত হবার ক্ষমতা কতখানি?'

'এটা আপনার বিনয়।'

'দাড়ান একটু। একটু অপেক্ষা করুন। আপনাকে এবারে আমি অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আলোটা নিবিয়ে দিই এবারে—নইলে ঠিকমত মন দিতে পারছি না।'

'দিন—মন দিতে যদি সুবিধে হয়, আলো নিবিয়ে দিন।'

ঘর অন্ধকার হল।

'এবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনাকে। স্পষ্ট। একটা বিরাট হীরের নেকলেস গলায় পরে আপনি নাচছেন।'

'আমি, আমি নাচছি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, নাচছেন।'

'হীরের নেকলেস পরে?'

'হ্যাঁ, হীরের নেকলেস পরে।'

'আমি কি একা নাচছি?'

'না, একা নন আপনি। সঙ্গে তিনি রয়েছেন, যাঁর কথা একটু আগে বলেছি আপনাকে।'

'কিন্তু আমি তো নাচতে জানি না!'

'আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি নাচছেন। তারপর···তারপর··· আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, স্পষ্ট দামী হোটেলে খাচ্ছেন···প্রচুর টাকা খরচ করছেন। আপনাকে দেখতে পাচ্ছি সুখী। কেবল আপনাকে নয়, আপনি এবং আপনার সঙ্গে যার শিগগীরই দেখা হবে, আপনারা দুজনেই সুখী, দুজনেই বিবাহিত, দুজনেই সমস্ত লোকের আকর্ষণ। প্রত্যেকে আপনাদের দিকে তাকিয়ে, প্রত্যেকেই আপনাদের সঙ্গে মিশবার জন্য ব্যাকুল। অসাধারণ পপুলার আপনারা···।'

'কি অদ্ভুত, কি আশ্চর্য, ঠিক আমার স্বপ্নের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।'

'তবে···।' জ্যোতিষী একটু থামলেন।

'তবে কি?'

'বাধা আছে। শান্তি দরকার, স্বস্ত্যয়ন দরকার, দেবতাদের দরবারে পূজো পাঠানো দরকার। কিন্তু সেসব কথা আমার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে বলা সম্ভব হবে না, কেননা, আপনার কুষ্ঠি, জন্মরাশি এ সমস্ত আমার কাছে নেই। আমি যা বললাম, মোটামুটি বললাম। এরকম অসাধারণ হাত আমি কখনো দেখিনি।'

'যত বাধাই থাক···' মহিলাটি বললেন, 'শান্তি-স্বস্ত্যয়নে কাজ হবে?'

'হবে না কেন, নিশ্চই হবে। ভগবান জগতে যেমন বাধার ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি ব্যবস্থা করেছেন বাধা দূর করবারও। বাধা—মুক্তি, মুক্তি—বাধা, এই তো জগত, এই তো দুনিয়া, এই তো বিজ্ঞান, এই তো ব্রহ্মাণ্ড, এই তো সব। এই তো সমস্ত দর্শনের মূল, এই তো সমস্ত মূলের দর্শন। তবে ঠিক কি কি করতে হবে কখন কখন করতে হবে, এ সমস্তই সামান্য ব্যাপার—খুব দুরূহ ব্যাপার নয়। যদিও সেটাই আসল ব্যাপার।'

নিঃশব্দে একটা কম-পাওয়ারের নীল আলো জ্বলে উঠল। ঘরটা আবার দৃশ্যমান হয়ে উঠল।

'আজ' জ্যোতিষী বললেন, 'এই পর্যন্তই আমার কাজ—আমার ভবিষ্যৎ দর্শন। এখন কোনো ব্যবস্থাপত্র দেব না—সেটা ভাল করে ভেবে চিন্তে পরে দেওয়া যাবে।'

'আপনি অসাধারণ।' বললেন মহিলাটি—'তবে একটা কথার উত্তর আমি চাই। আমার মনটা কেবলি খচখচ করছে, যখন থেকে আপনি বলেছেন সেই লম্বা ভদ্রলোকটির কথা, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে...বিয়েই তো হবে বললেন আপনি?'

'হ্যাঁ, আপনার বিবাহ যোগ আছে—বিয়েই হবে আপনি ধরে নিতে পারেন।'

'বেশ।' মহিলাটি বললেন, 'এবার একটা কথা বলুন, যদি সম্ভব হয়। আমার বর্তমান স্বামীটি, তিন বছর ধরে যার ঘর করে আমার প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করছে, সে লোকটা গোলমাল টোলমাল করবে না তো?'



বেতার বাদ্য

"আচ্ছা, রেডিয়োর নাটক কি সবই বাজনাদারদের জীবনী বা ঘটনা নিয়ে করতে হবে ?" সুখেনের মামা আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন। আমি এ ধরণের প্রশ্নের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না—রেডিয়ো আমি চালাই না, রেডিয়োর প্রোগ্রামও আমার পরামর্শে চলে না। আমাদের বাড়িতে একটাও রেডিয়ো নেই। আগে একটা ছিল, তা বছর তিনেক আগে সেটাকে পাশের বাড়ির দুটো কুকুর কোন্ ফাঁকে বাড়িতে ঢুকে চিবিয়ে চিবিয়ে একেবারে শেষ করে দিয়ে গিয়েছিল, সেই থেকে রেডিয়োর পাটই উঠে গেছে আমাদের বাড়ি থেকে। তবে রেডিয়ো যে একেবারে শুনতে পাই না তা নয়। আমাদের আশে পাশে বিস্তর বাড়ির রেডিয়োর আওয়াজ কানে ঢোকে না তাও নয়। দোকানে সিগারেট কিনতে গিয়েও রেডিয়োর আওয়াজ কানে এসেছে, তবে আজকাল কাদের জীবনী বা ঘটনা নিয়ে নাটক হচ্ছে সেটা জানতাম না। নাটক শোনবার মত ধৈর্য, তাও পাশের বাড়ির রেডিয়ো কিংবা সিগারেটের দোকান থেকে, আমার নেই। তাই আমি সুখেনের মামাকে বললাম, "তাই নাকি, হচ্ছে বুঝি, আমি জানিনা তো ?"

সুখেনের মামা সম্প্রতি ওকালতি ছেড়ে দিয়েছেন। মাস দুয়েক হল ডাক্তারের হুকুমে বাড়িতেই থাকতে হচ্ছে তাঁকে। প্রায় সম্পূর্ণ

বিশ্রাম—ভাল খাওয়া দাওয়া করা, পড়াশুনা বন্ধ, ডাক্তারের এই হুকুমের পর তাঁকে রেডিয়ো ছাড়া কোনরকম জিনিস হাতের কাছে দেওয়া হয়নি। খবরের কাগজও নয়। এরকম কয়েক মাস চালাতে হবে। কথা না বলে বলে তিনি অস্থির হয়ে উঠছিলেন, তাও ডাক্তারের হুকুমে তাঁর কাছে কাউকেই এতদিন যেতে দেওয়া হয়নি। এখন একটু ভাল আছেন তাই বাধা নিষেধ একটু কম। আমার সঙ্গে কথা বলায় ডাক্তারের আপত্তি নেই।

"জানিনা তো মানে?" তিনি আমার কথাটা বুঝতে পারেননি। আমি বললাম, "জানিনা তো, মানে হল গিয়ে আমি জানি না। আমি ঠিক অনুধাবন করিনি এই আর কি।"

"কেন, কেন তুমি অনুধাবন করনি?" তিনি আর একটি প্রশ্ন করলেন।

"কুকুর..." আমি বললাম, "কুকুরের দুর্মতির ফলে...।"

সুখেনের মামা খ্যাঁক করে উঠলেন। "কুকুরের দুর্মতির ফলে !!"

আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কুকুরের দুর্মতির ফলে। আমাদের পাশের বাড়ির অদ্বৈতদের দুটো কুকুর, দেখতে অনেকটা বুলডগের মত, কিন্তু ঠিক বুল-ডগও নয়। একটার নাম কালু অন্যটার নাম ভুলু। তাদের দুজনের মধ্যে দারুণ ভাব। একদিন আমার রেডিয়োটা বাজছিল বৈঠকখানায়, ঘরে কেউ ছিল না, হঠাৎ রেডিয়োটা বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের বাড়িতে কেউ খেয়াল করেনি। পরে দেখা গেল সমস্ত ঘর জুড়ে রেডিয়োর ভগ্নাংশ, তাতে কুকুরের দাঁতের দাগ।"

"তখন কি প্রোগ্রাম হচ্ছিল বল তো?" সুখেনের মামা জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি ঠিক জানি না।" আমি বললাম।

"যে প্রোগ্রামই হক, কুকুরদের পছন্দ হয়নি সেটা নিশ্চয়। পছন্দ হলে রেডিয়োটাকে ভাঙত না। এমন সব প্রোগ্রাম হয় যা সত্যি কুকুরদেরও ভাল লাগার কথা নয়।" সুখেনের মামা বললেন।

আমি বললাম, "আজকাল কি খুব বজনাদারদের জীবনী বা কাহিনী নিয়ে নাটক হচ্ছে ?"

সুখেনের মামা বললেন, "খব মানে, প্রত্যেকটি। কোনটি বাদ দেখলাম না। যে নাটক শুনি সেটাই কোন না কোন বাজনাদারের ব্যাপার। এক একটা নাটকে আবার ছ সাতটা বাজনাদারের চরিত্র। যতগুলি চরিত্র ততগুলি বাজনাদার, কিংবা এও বলা যায়, যতগুলি বাজনাদার ততগুলি চরিত্র।"

আমি এবারে একটু সন্দেহ প্রকাশ করলাম। বললাল, "মামা, তাকি কখনও হয় ? আপনি নিশ্চয় ভুল শুনেছেন। মানে, আপনি বোধ হয় ঠিক মত অনুধাবন করেন নি।"

সুখেনের মামা গর্জে উঠলেন। "ঠিকমত অনুধাবন করতে আমার বাধা কি শুনি ? আমার ছুটি কান নেই ? আমার কানের কাছে রেডিয়ো নেই ? আমার মাথার ভিতর মগজ নেই ?"

আমি বললাম, "তা কেন মামা—আমি কি তাই বলছি ? তবে এটা কি করে সম্ভব হয় যে সমস্ত নাটকগুলোর সমস্ত চরিত্রই বাজনাদারদের চরিত্র ?"

সুখেনের মামা বললেন, "তুমি আসলে কি চাও বলো ত ?"

আমি একটু বিরক্ত হয়েছিলাম বোধ হয়। বললাম' "আপনি কি বলতে চান বলুন তো ?"

সুখেনের মামা বললেন, "আমার কথা তো আমি বলছি !"

আমি বললাম "আমার কথাও আমার বলা হয়ে গেছে—এটা হতেই পারে না, যে রেডিয়োতে যে সমস্ত নাটক হয় সেগুলোর সমস্ত চরিত্রই বাজনাদারদের চরিত্র। মানে, ভুল বুঝবেন না, হতে ঠিকই পারে, তবে আমার বিশ্বাস হয় না।"

সুখেনের মামা বললেন, "বিশ্বাস হয় না ?"

আমি বললাম "না।"

আমার দিকে কটমট করে তাকালেন সুখেনের মামা। আর তখনি মনে হল তাঁর বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যিনি

চিরকাল বক্ বক্ করে এসেছেন তাঁকে এখন কেবাল শুনতে হচ্ছে দিনের পর দিন, কোনো কথা বলার অবকাশ হচ্ছে না। একটু মাথার গোলমাল হওয়া অসম্ভব নয়।

তিনি হঠাৎ ঘড়ি দেখে বললেন, "আর দুমিনিট বসবে?"

আমি বললাম, "কেন বলুন তো?"

তিনি বললেন, "তাহলে প্রমাণ করে দিতাম। আর দু মিনিট পর 'শেষ খুন' বলে একটা নাটক হচ্ছে। সেটা শুনলেই বুঝতে পারবে।"

এবার আসল ব্যাপারটা বোঝা যাবে বলে মনে হল। তার মাথার গোলমাল টোলমাল হচ্ছে কিনা, 'শেষ খুন' নাটকটা শুনলেই বোঝা যাবে।"

তিনি রেডিয়োটা চালিয়ে দিলেন। আর তৎক্ষণাৎ ঘোষণা শোনা গেল: "...শেষ খুন সুরু হচ্ছে, অভিনয়ে রয়েছেন...।" সুখেনের মামা বললেন, "এবার মন দিয়ে শোনো। নাটক সুরু হচ্ছে।"

নাটক সুরু হল, গোয়েন্দা বীরু সহকারী দেবুকে বললেন—জানো দেবু, কদিন ধরে একটা কথা ভাবছি। দেবু বলল—কি ভাবছেন শুনতে পারি কি? গোয়েন্দা বীরু বললেন, ভাবছি পরিত্রাহিপুরের মহারাজার হারে চুরির ব্যাপারটা থেকে হাত গুটিয়ে নেব কিনা? দেবু বলল, এ কি বলছেন আপনি, হাত গুটিয়ে নেবেন, হাত? গোয়েন্দা বীরু বললেন, হঁ্যা হাত। তুমি কি ভাবছিলে? দেবু বলল, আমি ভাবছিলাম জাল গুটিয়ে আনবেন। এই তো জাল গুটনোর সময়। দশদিন ধরে আপনি অনুসন্ধান করছেন, একজনকে সন্দেহও করছেন রীতিমত, এই সময় হাত গুটিয়ে নেওয়া কি ভাল? এই সময় অপরাধী দেখবে চারিদিক থেকে জাল গুটিয়ে আসছে তার দিকে। ধীরে ধীরে তাকে ঘিরে ফেলেছে। পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই...তা না করে আপনি যদি হাত গুটিয়ে নেন্....(হঠাৎ দরজায় ধাক্কা) ..খুব জোর ধাক্কার আওয়াজ, মনে হচ্ছে কেউ কোনো বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে আজ এসেছে।

ঐ আবার আওয়াজ। খুলে দিই দরজা। গোয়েন্দা বীরু বললেন, না খুল না। দরজা খুল না। দিক ধাক্কা। আজ আমার ভাল লাগছে না। দেবু বলল, ঠিক কি হয়েছে বলুন তো আপনার? গোয়েন্দা বীরু বললেন···তবে শোনো। আমি সন্দেহ করেছিলাম পরিত্রাহিপুরের মহারাজার ড্রাইভার জোরজবরদস্ত সিংকে। সে তো তুমি জানো। যখন মহারাণী গাড়িতে করে পার্টিতে যাচ্ছিলেন তখন তার হীরের লকেকটা কোথায় হারিয়ে যায়। মনে হয় গাড়ির ভেতরেই পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু অনুসন্ধান করেও সেটাকে পাওয়া যায় না। বহু লোককে সন্দেহ করা হয়। পুলিস সন্দেহ করে সহরের নামকরা হীরে চোর দুর্বার সর্বাধিকারীকে। তাকে গ্রেপ্তারও করে। কিন্তু দুর্বার সর্বাধিকারী সেদিন সে তল্লাটেই ছিল না। সে প্রমাণ করেছে যে হীরে যখন হারিয়ে যায় তখন সে ডায়মণ্ডহারবারে দুটো লোককে খুন করছিল। প্রমাণ স্বরুপ সে মাটি খুড়ে দুটি লাসও দেখায়। ফলে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যাক্ পুলিসের সন্দেহ এরপর আরো অনেকের উপর হয় কিন্তু আমি জানি এ কাজ করেছে জোরজবরদস্ত সিং—প্রমাণও আছে।

দেবু বলল, যদি প্রমাণই থাকবে তাহলে তাকে ধরছেন না কেন বলুন তো? গোয়েন্দা বীরু বললেন, কেমন করে তা করি বলো, আসলে জোরজবরদস্ত সিং হচ্ছে আমার নিজের শ্যালক। ওর নাম হচ্ছে জোয়ার জোয়ারদার। বাঙালি ড্রাইভার কেউ রাখে না বলে সে নাম ভাড়িয়ে জোরজবরদস্ত সিং সেজেছে, শ্রেফ হীরে চুরির উদ্দেশ্যেই। হীরেটাও তার কাছে আছে। এখনো বেচেনি। ও বলছে ঠিক মত বেচতে পারলে লাখ পাঁচেক পাওয়া যেতে পারে। আমাকে ও প্রস্তাব দিয়েছে যে যদি আমি ওটাকে বেচতে সাহায্য করি তাহলে অর্ধেক তার, অর্ধেক আমার।

দেবু বলল, তাহলে আমার কি হবে?

গোয়েন্দা বীরু বললেন, এখন তোমার কি হবে সেটা ভাবার সময়? এখন ভাবার সময় হল আমার কি হবে, জোয়ারের কি হবে,

হীরেটা কোথায় বেচা যাবে, কে কিনবে, সম্পূর্ণ গোপনে কি ভাবে করা যাবে এই সব। এখন তোমার কি হবে সে প্রশ্ন আসে না। তবে এটা জেনে রেখ, যদি আমরা টাকা পয়সা পাই তা থেকে তোমাকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হবে না। কিন্তু সমস্তটাই নির্ভর করবে পরিত্রাহিপুরের রাজকুমারী সুনন্দার উপর। আমি তাকে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছি…।

দেবু বলল, প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ?

গোয়েন্দা বীরু বললেন, হ্যাঁ প্রস্তাব পাঠিয়েছি।

দেবু বলল, পরিত্রাহিপুরের একমাত্র যুবতী, সুন্দরী, শিক্ষিতা সুনন্দাকে আপনি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ? কি সে প্রস্তাব ?

গোয়েন্দা বীরু বললেন, সে কথা এখন অপ্রকাশ্যই থাক। তবে জেনে রেখো, আমার প্রস্তাব যদি সে গ্রহণ করে তাহলে দারুণ ব্যাপার হবে। আর রাজকুমারী যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাহলে জোয়ারের প্রস্তাবেই সম্মত হতে হবে !

দেবু বলল, আমার মনে হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি ! আপনি কাল একখানা পঞ্জিকা কিনে আনিয়েছিলেন। এখন বছরের প্রায় সাতটি মাস চলে গেছে, এই সময় যদি কেউ পঞ্জিকা কেনে, তাও আড়াই টাকা খরচ করে, তার একটি মাত্র উদ্দেশ্য আমি অনুমান করতে পারি। আপনার সঙ্গে আমার আঠারো বছরের শিক্ষানবিশী একেবারে বৃথা যাবার কথা নয়।

গোয়েন্দা বীরু বললেন, কি উদ্দেশ্য অনুমান কর ত ?

দেবু বলল, আপনার প্রয়োজন আছে—কোনো গূঢ় প্রয়োজন আছে। আমার মনে হয় আপনি বিবাহের দিন কাল দেখবার জন্যই…।

হঠাৎ রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরেই শোনা গেল… অনিবার্য কারণ বশত রেকর্ডটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাকি অংশ এখন প্রচার করা সম্ভব হল না। তার পরিবর্তে সুরেন্দ্র সুরের গাওয়া একুশখানি গান পর পর বাজিয়ে শোনানো হচ্ছে।

সুখেন্দুর মামা বললেন, "বুঝলে ব্যাপারখানা ?"

আমি বললাম, "দারুণ গোয়েন্দা কাহিনী—বন্ধ হয়ে যাওয়াতে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।"

সুখেন্দুর মামা বললেন, "কেমন, যা বলেছিলাম তা ঠিক কিনা ?"

আমি বললাম, "এটা তো গোয়েন্দা কাহিনী, এর মধ্যে কোনো বাজনাদারের চরিত্র তো দেখতে পেলাম না ?"

সুখেন্দুর মামা বললেন, "কেন, দুটি চরিত্রই তো বাজনাদারের চরিত্র।"

আমি বললাম, "আপনি বলছেন কি মামা, দুটি চরিত্রই তো গদ্যময় গোয়েন্দা আর তার সহকারী। এরা বাজনাদার হবে কেন ?"

সুখেন্দুর মামা বললেন, "তাহলে তুমি শুনলে কি ?"

আমি বললাম, "কেন, আপনি যা শুনলেন আমিও তাই শুনলাম ?"

সুখেন্দুর মামা বললেন, "ছাই শুনেছ ! প্রথমেই তো নাটক সুরু হল বাজনার ভেতর দিয়ে···টুং টুং টুং টঙা টং মনে হয় কেউ বোধ হয় জলতরঙ্গ বাজাচ্ছিল, গোয়েন্দা বীরু নিজেই সম্ভবতঃ নয়ত তার সহকারী। এ দুজন ছাড়া যখন এর মধ্যে চরিত্র নেই, তখন এদেরই একজন বাজাচ্ছিল নিশ্চয়।"

আমি বললাম, "মামা, ওরা বাজাবে কেন ? ওটা তো আবহ সঙ্গীত। যে সঙ্গীত বাক্যসমূহকে বহন করে কিংবা যে সঙ্গীত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তাকে বলে আবহ-সঙ্গীত।"

"আবহাওয়ার সৃষ্টি করে ?" সুখেনের মামা ভুরু কোঁচকালেন। "সঙ্গীত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে কেমন করে—কিসের আবহাওয়ার ?"

আমি বললাম, "মানুষের মনের আবহাওয়ার, মুডের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে সঙ্গীত। বলা চলে সঙ্গীত হল কথার সঙ্গত। কথাকে আরো অর্থবহ করে তোলে। যখন নায়ক আনন্দে থাকে তখন হালকা সুর তার সেই মনোভাবকে প্রকাশ করে, যখন দুঃখে থাকে তখন প্রকাশ করে গাম্ভীর্যকে, যখন শোকে থাকে তখন

আরো বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়: যখন কেউ আতঙ্কে থাকে তখন গম্ভীর কেঁপে কেঁপে ওঠা ঢাক বাজে।"

সুখেনের মামা বললেন, "বাজে, কোথায় বাজে?"

আমি বললাম, "রেডিয়োয় বাজে, আবার কোথায় বাজবে?"

সুখেনের মামা বললেন, "আমি যখন কথা বলি, দুঃখে আমার যখন হৃদয় ভেঙে যায় তখন তো কই বেহালার আওয়াজ পাই না কোথাও? এমন কি একটা যে ডুগী তবলা বাজবে, তাও তো হয় না। বাঁশীও না, তবে রেডিয়ো বললেই অমনি বাজনা বাজে কেন?"

আমি বললাম, "বাজানো হয় বলেই বাজে।"

সুখেনের মামা বললেন, "আমিও তো তাই বলছিলাম—রেডিয়োয় যেই কথা বলুক না কেন, সেই বাজায়। দারুণ ভাল বাজায় স্বীকার করতেই হবে। এই তো দেখলে একটু আগে, গোয়েন্দা যখন বলছিলেন, না—দরজা খুল না। দরজা খুল না। দিক ধাক্কা...তখন ঢাক বাজছিল। এখন এই ঢাক কে বাজাচ্ছিল? আমার মনে হয়, হয় গোয়েন্দা নিজে, নয় তার সহকারী... কিংবা এও হতে পারে, হ্যাঁ এখন মনে হচ্ছে, এটাও হতে পারে যে ধাক্কা দিচ্ছিল সে হয়ত নিজেই ঢাক সঙ্গে এনেছিল। মোট কথা রেডিয়োর নাটকে যে কথা বলে সেই বাজায়!"

আমি বললাম, "মামা, আপনি ভুল বুঝেছেন। কি করে বোঝাই আপনাকে। যারা কথা বলে তারা বাজায় না। অন্য লোকে বাজায়।"

সুখেনের মামা বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি পেয়েছ—যত সব বাজে বাজে কথা? যে কথা বলে সেই বাজায়—কিংবা নাটকের অন্য লোক বাজায়—কেন না অনেক সময়ে দেখেছি কথাও শোনা যাচ্ছে বাঁশিও বাজছে একই সঙ্গে। তবে একেবারে বাইরের লোক বাজায় না এটা জেনে রেখো। এই নাটকে গোয়েন্দা এবং সহকারী, দুজনেই বাজায় ভাল। একবার মনে হল পিয়ানোও

বাজিয়েছিল, একবার বেহালা, আর ঢাকের কথা তো বললামই। যে লোকটা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল সেও বাজনাদার। মোটকথা, রেডিয়োর নাটকে যারাই কথা বলে তারাই বাজানাদার। অদ্ভুত অবিশ্বাস্য নয়? মানে বাস্তবে তো ঠিক এমনি হয় না যে সকলেই কিছু না কিছু বাজায়? আর তাই তো বলছিলাম রেডিয়োতে কেবলি শুনি বাজনাদারদের নিয়ে নাটক করা হচ্ছে। এ এক ধরণের পক্ষপাতিত্ব, নয় কি?"

আমি বললাম, "দেখুন, আপনার মাথায় কিছুতেই একটা কথা ঢোকাতে পারছি না। যে লোক কথা বলে, আর যে লোক বাজায় তারা আলাদা লোক।"

সুখেনের মামা বললেন, "তাহলে তুমি বলতে চাও যখন একা বন্দিনী একটা মেয়ে—সেদিন একটা প্রাচীন নাটকে শুনলাম—কথা বলছে আপন মনে কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই, অথচ বাঁশি বাজছিল সুর করে করে সে নিজে বাঁশি বাজাচ্ছিল না?"

আমি বললাম, "কি করে বাজাবে—একই সঙ্গে কথা বলা আর বাঁশি বাজানো কি সম্ভব?"

সুখেনের মামা বললেন, "তার মানে, সে একা ছিল না—অন্য লোক ছিল। বেটি এক নম্বরের ন্যাকা—সঙ্গে লোক রয়েছে আর দুনিয়া সুদ্ধ লোককে জানাচ্ছে যে সে একা! জঘন্য কারবার—মিথ্যেবাদী কাঁহাকা....!"

আমি দেখলাম মামা ক্রমেই খেপে উঠছেন। তার শরীর অসুস্থ এ অবস্থায় উত্তেজনা ভাল নয়। বললাম, "সঙ্গে লোক কেউ নাও থাকতে পারে। সঙ্গে হয়ত গ্রামোফোন ছিল, কিংবা টেপ রেকর্ডার!"

সুখেনের মামা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, বললেন, "বললাম না প্রাচীন নাটক—সেই কোন যুগের? তখন গ্রামোফোনই বা কোত্থেকে আসবে, আর টেপ রেকর্ডারই বা কোত্থেকে আসবে?"

সুখেনের মামা বললেন, "ঠিক বলেছ। তাহলে ঐ মেয়েটিই

মিথ্যেবাদী, আর তার মানেই ঐ বাঁশীওলার সঙ্গে তার তলে তলে পীরিত—উঃ কি ফাঁহাবাজ মেয়ে—কি সাংঘাতিক পাপীয়সী। কি কারবার। মিথ্যে কথা বলার জন্য এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য কেস ঠুকে দেব একদিন। বাপ্‌রে বাপ্‌রে—কি মেয়ে।..."

তিনি বলেই চললেন, থামলেন না। আমি যে এক সুযোগে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেলাম তাও তিনি উত্তেজনায় আর নিজের বক্তৃতার তোড়ে খেয়াল করলেন না।



সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে

—ক্ষিদে ? ক্ষিদে পেয়েছে আপনাদের ?

লোকটি যাদুকর নিশ্চয়। সিড়িঙ্গে চেহারার লোকটি, পরণে দামী কাপড়ের স্যুট কিন্তু তেমন ধোপদুরস্ত নয়। চোখে একজোড়া বড় গোল চশমা—কালচে গোছের। তার ভেতর দিয়ে সে ঠিকই দেখতে পায় স্পষ্ট, কিন্তু তার চোখ অন্যের কাছে থাকে অদৃশ্য। চুল দেখে মনে হয় কেউ যেন যত্নের সঙ্গে সাজিয়েছে। আমি আর রামানন্দ দুজনে গড়ের মাঠে চুপচাপ বসেছিলাম—দু একবার কয়েকটা করে চিনে বাদাম চিবিয়েছি, আর এখন কেবল রয়েছে বাড়ি ফিরবার সেকেণ্ড ক্লাস ট্রাম ভাড়া। আর এই সিড়িঙ্গে লোকটাও হাতে অ্যাটাশে ব্যাগ নিয়ে অনেকক্ষণ আমাদেরই কাছাকাছি ঘুরঘুর করছিল, কেন করছিল কে জানে। ঘুরঘুর করছিল, এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল আর ঘনঘন হাতের কব্জির সঙ্গে বাঁধা একটা বিরাট ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। ইতিমধ্যে দু'দশবার নানারকম ফিরিওলা আমাদের কাছে এসে যাচিয়ে গেছে। কেউ জিজ্ঞেস করেছে আমাদের কানে খোল টোল আছে কিনা, থাকলে চার মিনিটে সব সাফ করে দিতে পারে সে, মাত্র আট আনা। একজন এসে প্রস্তাব করে গেল বারো আনায় সে এমন দারুণ মাথা টিপে দিতে পারে যে সারা জীবন

তা আমাদের মনে থাকবে। জুতো পালিশওলাও দুএকজন এসে আমাদের জুতোগুলিকে আয়নার মত চকচকে করে দেবে বলেছে। একজন বুড়ো গোছের লোক আবার এসে বলল, তার দুটো মেয়ে কাছাকাছি বসে আছে, খুব ভয় পাচ্ছে। আমাদের কাছে তাদের রেখে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য একটা কাজ সেরে আসতে পারে কিনা। এই ব্যাপারে রামানন্দ খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল, ভেবেছিল এর জন্য বুঝি কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। কিন্তু যখন শুনল এর জন্য উলটে আমাদেরই টাকা দিতে হবে, তাও কুড়ি টাকা করে তখন রামানন্দের রাগ দেখে কে! বেচারা রামানন্দ ন মাস হল বেকার হয়েছে, কোথাও চাকরি টাকরি হচ্ছে না। এখন ভাবছে দু চারটে প্রবন্ধ লিখে ছাপিয়ে আয় করবে। গড়ের মাঠে বসে গড়ের মাঠের হাওয়া গায়ে লাগাতে হবে, চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে, নইলে প্রবন্ধ ঠিক জমবে না। আমি ওর সঙ্গে এসেছি, আমার অবস্থা ওর চাইতে অবশ্য ভাল—আমার চাকরি যায় নি। যাবার কথাও অবশ্য নয়, চাকরি আমি এখনও পাইনি। মাঝে মাঝেই দু-একটা ভিখারী আসছে—এক মুহূর্তও যেন এখানে চুপচাপ থাকবার জো নেই।

একটু দূরেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। সেখানে কত লোক গাড়ি থামিয়ে ভেলপুরী আর ফুচকা খাচ্ছে। দু একটা আলো জ্বলে উঠল। ক্ষিদে সত্যিই পেয়েছে। এবারে উঠতেই হবে!

ঠিক সেই সময়েই সেই লোকটি আমাদের বলল—ক্ষিদে? ক্ষিদে পেয়েছে আপনাদের?

কোনো দড়ি আছে এর সঙ্গে নিশ্চয়। খামোখা আজকাল কেউ কাউকে ক্ষিদের কথা জিজ্ঞেস করে না। আমি এ বিষয়ে কি যেন একটা জ্ঞান দিতে চেষ্টা করতে যাব, রামনন্দ চট করে বলল, ক্ষিদে তো পেয়েইছে।

লোকটা আমাদের কাছে এসে বসে পড়ল। আর ঠিক সেই সময়—কুলপি,—কুলপি করতে করতে একটা লোক যাচ্ছিল, সে যেন চুম্বকের মত আমাদের কাছে এসে একটা পাথরের মূর্তির মত

দাঁড়িয়ে গেল। সিড়িঙ্গে লোকটি বলল, তিনঠো দারুণ কুলফি লাও। বলে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করল। কুলফিঅলা শালপাতার উপর তিনটে কুলফি রাখল। আমার তখন আর আপত্তি করার কথা মনে এলো না। মনে এলেও মুখে তো একেবারেই না।

কুলফিঅলা খুচরো ফেরত দিয়ে চলে গেল অন্ধকারে। আন্দাজে মনে হল এক একটা কুলফির দাম দেড় টাকা। আস্তে আস্তে, বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা তিনজনে তিনটে কুলফি খেয়ে নিলাম! আমি আর ঐ সিড়িঙ্গে লোকটি শালপাতা ফেলে দিলাম—রামানন্দ কিন্তু দেখলাম শালপাতাটিকে বেশ আদরের সঙ্গে চাটছে, কিছুতেই যেন সে ছাড়তে পারছে না। কিন্তু শালপাতা যত ভালই হক, সমস্ত জীবন তা নিয়ে চাটাচাটি করা যায় না। বেশ কয়েক মিনিট পর শাল-পাতাটিকে ফেলে দিয়ে রামানন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর খুব গম্ভীরভাবে বলল, থ্যাংকস !

—ডোণ্ট মেনশন! সিড়িঙ্গে লোকটি বলল। কুলফি ভাল লেগেছে ?

এইবার আমার মুখ একটু খুলল—হ্যাঁ, কুলফি ভাল লেগেছে, দারুণ জিনিস, কিন্তু আপনি খামোখা.... ।

এই সময় একটি আলুকাবলিঅলা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সিড়িঙ্গে লোকটি বলল, আলুকাবলি দাও তো দেখি তিন জায়গায় আট আনা করে !

আট আনা এক একজন ! কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, বলা হল না। বলার সময় অনেক পাওয়া যাবে। তার আগে আলুকাবলিঅলা ইচ্ছে করে কম কম দিচ্ছে—কিন্তু তা নিয়ে কিছু বললাম না। আমাদের তো পয়সা নয়—যার পয়সা সে তো দিব্যি নির্বিকার।

আলুকাবলি ফুরিয়ে গেল। লোকটি দারুণ কোন চাঁই হবে। পয়সা খোলামকুচির মত এমন খরচ করার কথা বইতে-টইতে পড়েছি, কিন্তু এমন চাক্ষুষ দেখা হয়নি। ভাবলুম, হয়তো এর দৌলতে

চাকরির একটা ব্যবস্থা হতে পারে। এরকম লোকেরাই চাকরি দিতে পারে। আমি বললাম, দেখুন, আপনার নাম জানি না, কিছু না, কিন্তু মনে হয় আপনি হৃদয়বান। আমাদের কথা আপনি বুঝবেন। আমি হরিদাস সিকদার, আর আমার বন্ধু রামানন্দ চট্টরাজ দুজনে ডাহা বেকার। চাকরি নেই, টিউশানি নেই (কথাটা মিথ্যে—আমরা দুজনেই একটা করে টিউশানি করি) আমাদের অবস্থা খুব, খু-ব খারাপ। আপনি যদি একটা চাকরির ব্যবস্থা…।

লোকটি বলল, চাকরি? চাকরি করে কে কবে বড় লোক হয়েছে বলুন? চাকরির আইডিয়া ছাড়তে হবে। পশ্চিম বাংলার যুবকদের এখন নতুন পথের সন্ধান করতে হবে। চাকরি হট করে পাওয়া যায় না, আর না যাওয়াই উচিত। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য ব্যবসা করা উচিত। এই তো দেখুন না আমাকে। ছিলাম একজন আর্টিস্ট, দারুণ ছবি আঁকতাম। এক—একটা ডিজাইন আঁকতে দু-তিন মাস লেগে যেত, কিন্তু যখন বিক্রি করতে যেতাম তার ঠিক মূল্য পেতাম কি? দুশো, বড়জোর পাঁচশো টাকা! তখন ভাবলাম, চাকরি নেব। চাকরি কেউ কেউ দিতেও চেয়েছিল, কিন্তু আমি আর্টিস্ট শুনে সব পিছিয়ে গেল, যেন আমার দুরারোগ্য সংক্রামক কোনো অসুখটসুখ আছে! এজেনসিতে কাজ নিতে গিয়ে শুনি আমি যে ধরণের ছবি আঁকি তাতে এজেনসির কাজে পোষাবে না।

লোকটা বড়ই বকবক করছে। কোথায় আমাদের চাকরির ব্যবস্থা, আর কোথায় জ্ঞান বিতরণ! মনে মনে বললাম, দুঃশালা, লোকটা এখন কেটে পড়লে বাঁচি। লোকটাকে প্রথমে যাদুকর ভেবেছিলাম, এখন দেখছি জ্ঞান বিতরণ করছে। যাদুকর না ছাই! তবে কথার যাদুকর বলা নিশ্চয় যায়।

অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। লোকটি কি বলে চলল জানি না—ভাবতে লাগলাম, এবারে কেমন করে কেটে পড়া যায়। কিন্তু কেটে পড়া গেল না অন্ধকার হয়ে আসছিল—আবার সেই লোকটি এসে হাজির যার নাকি দুটো মেয়ে। বুড়ো গোছের লোকটি এসে বলল,

তার তিনটে মেয়ে কাছেই রয়েছে। তারা আমাদের কাছে ঘন্টা দুয়েক বসতে পারে কিনা, কেন না তার এক জায়গায় একটা কাজ সারতে হবে। মেয়েরা একা থাকতে ভয় পাচ্ছে। আমরা ভদ্রলোক বলেই বিশ্বাস করে রেখে যেতে চায়। তবে এর জন্য কুড়ি টাকা…।

রামানন্দ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম নিশ্চয়ই আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে—একটু আগেই লোকটি এসে বলেছিল তার দুটি মেয়ে, এখন আবার বলছে তিনটি। বোধহয় দুটিই বলেছিল আগে। যাকগে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, পয়সা-কয়সা আমাদের নেই, আর সময়ও নেই—কিন্তু সিড়িঙ্গে লোকটি বলল, তা বেশ তো, নিয়ে আসুন না। বলতেই লোকটি অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা সিড়িঙ্গে লোকটিকে বললাম, একি ব্যাপার মশাই অ্যাঁ, আপনার কি বাপের জমিদারী আছে? আমাদের কিন্তু একটি আধলাও পকেটে নেই। তা ছাড়া দিনকাল ভাল নয়, অপরিচিত সব ভুঁইফোঁড় লোকের কথায় এসব…। রামানন্দ বলল, তাছাড়া ওর মেয়েদের আমরা পাহারা দেব তার জন্য আমরা টাকা দেব কেন মশাই—এর আগে তাই তো ওকে ভাগিয়ে দিয়েছিলাম, আবার শালা এসেছে—এবারে বলছে ওর তিন মেয়ে ও ডাহা মিথ্যেবাদী। এবারে আমরা কেটে পড়ি, আয়রে হরিদাস উঠি। বলে রামানন্দ উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও। দুজনে কয়েক পা গিয়েছি, এমন সময় সিড়িঙ্গে লোকটা বলল, ব্যবসার আইডিয়া দিচ্ছিলাম আপনাদের—সে সব শেষ না করেই কেটে পড়ছেন, পড়ুন! লোকটির কথায় কেমন যেন আবেদন ছিল, বোধহয় কিছু শক্তিও। ওয়েস্টার্ন ছবিতে দেখেছি ল্যাসো ছুঁড়ে ঘোড়াদের ধরে ফেলে, লোকটি যেন একটা অদৃশ্য ল্যাসো ছুঁড়ে ঠিক তেমনি করে আমাদের ধরে ফেলল। আমরা থমকে দাঁড়ালাম। রামানন্দকে বললাম, গড়ের মাঠ নিয়ে প্রবন্ধ লিখবি বলছিলি না? চল দেখি কি হয়। আমরা গুটি গুটি গিয়ে আবার বসলাম। অন্ধকার আরো বেড়ে গেল, তবে হালকা হালকা ভাবে আমরা কাছাকাছি

কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। রামানন্দ আমার কাছেই বসে আছে, তার মুখ অনেকটাই স্পষ্ট, কিন্তু একটু দূরে সিড়িঙ্গে লোকটার মুখ তেমন স্পষ্ট নয় আর কথা বলার সময় দাঁত দেখা যাচ্ছিল, কালোর মধ্যে দাঁতগুলিকে অস্বাভাবিক সাদা দেখাচ্ছিল।

সিড়িঙ্গে লোকটি বলল, আসল কথা হল ব্যবসা। ব্যবসা ঠিক মত করতে জানলে কারুর বাপের সাধ্যি নেই উন্নতি রোধ করে। এখন চলছে সেলারস মারকেট—সেলারস মারকেট, দেখছেন না দোকানদার যা খুশি দাম চাইছে, বাজারে দশ টাকা কেজিতে লিচু বেচছে, পঁচিশ টাকা কেজিতে চিংড়ি মাছ?

চিংড়ি মাছের কথায় হঠাৎ মনটা উদাস হয়ে গেল। বছর দেড়েক ঐ বস্তুটি চোখে দেখা হয়নি।

—অতএব, লোকটি বলল, ব্যবসা। ব্যবসাই করা দরকার। এক-একটি ব্যবসাদার দেখুন, তাদের কিছুর অভাব আছে? আমি আপনাদেব দু'দশটা আইডিয়া দেব—তার আগে আমার কথা শুনুন। বুঝলেন মশাইরা, আমিও ভেবেছিলাম আমার জীবনে কিছু হবে না। কিন্তু মনে মনে একদিন প্রতিজ্ঞা করলাম, এমন জীবন কাটাব না। কিছুতেই না।

রামানন্দ দেখলাম, নিবিষ্ট হয়ে শুনছে। এইসব বাজে কথা বলে যাবে লোকটা আর তাই শুনতে হবে!

—চা! চা! চা!

একটা লোক ধুমায়িত চা নিয়ে এসে আমাদের পাশে বসে পড়ল। চায়ের গন্ধে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত শুকিয়ে তেষ্টা পেয়ে গেল।

—তিনটে চা! সিড়িঙ্গে লোকটি বলল, না—ছটা চা দাও। তিন কাপ এক্ষুনি, আর বাকি তিন কাপ একটু বাদে।

এমন সময় একটা গুণ্ডার মত চেহারার লোক এসে হিন্দী বাংলাতে মিশিয়ে বলল, আপনাদের কাছে স্লাই হোগা?

আমার পকেটে একঠা 'স্লাই' ছিল—আর একটা মাত্র চারমিনার। তাই এতক্ষণ বার টার করিনি। রামানন্দও জানত না, জানলে কখন

চেয়ে চেয়ে শেষ করে দিত। আমি উসখুস করলাম। একটা সিগারেট ধরাতে লোকটা হয়ত দশটা কাঠি জ্বালাবে, যা হাওয়া বইছে। এই সময় লক্ষ্য করলাম আকাশের একদিকে কালো হয়ে এসেছে, আর একটু পরে হয়ত বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে, কেননা, মেঘের মধ্যে মধ্যে ছিঁচকে হাসির মত বিদ্যুৎ একটু একটু হাসছিল। সিড়িঙ্গে লোকটা পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে দিল, আর সেই গুণ্ডা মত লোকটা পকেট থেকে একটা পোড়া বিড়ি বার করে পর পর এগারোটা কাঠি জ্বেলে শেষ করল অথচ বিড়িটাই ধরাতে পারল না। শেষে সিড়িঙ্গে লোকটা অধৈর্য হয়ে দেশলাইটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বিড়িটাকে ধরিয়ে দিল, কিন্তু গুণ্ডা মত লোকটা বিড়ি টেনে দম আটকে কেশে অস্থির।

যখন লোকটা এমনি করে কাশছে আর আমরা জানি না কি করা যায়, এমন সময় কোত্থেকে আবার সেই বুড়োটা এসে হাজির হল। বলল, আচ্ছা, আপনারা যে টাকা দেবেন তার কি স্থিরতা আছে?

এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। সিড়িঙ্গে লোকটা ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলো, বিশ্বাস করছেন না আমাদের? আমরা সব ভদ্রলোকের ছেলে, কি বলেন আপনারা? এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনার সন্দেহ কোত্থেকে হল কে জানে। তাছাড়া, আগে আপনার মেয়েদের দেখি, তবে তো পয়সা। বয়স কি রকম, কমটম তো, নাকি বুড়িমার দল?

বুড়ো বলল, কচি কচি মেয়েরা সব—খুবই কচি।

সিড়িঙ্গে লোকটা বলল, সবাই ওসব কথা বলে। যাই হক, আমরা ভদ্রলোক, টাকা পয়সা বাকি রাখি না। এই বলে ব্যাগ থেকে নতুন নতুন ঝকঝকে এক গাদা নোট লোকটিকে দিয়ে দিল। এই দৃশ্য দেখে আমরা চোখ ছানাবড়া করলাম, আর সেই গুণ্ডা মত লোকটি যার বিড়ি টানতে গিয়ে দম আটকে যাচ্ছিল সে হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠল। বুড়ো লোকটি বলল, আমিও স্যর ভদ্রলোক। বলে

কি রকম অদ্ভুত রকমের হেসে উঠল, আর সেই সময়েই তু চার ফোটা বৃষ্টি পড়ল। আমি বললাম, এই সেরেছে!

সিড়িঙ্গে লোকটি হঠাৎ খ্যাপার মত গলায় বলল, যান তাড়াতাড়ি আপনার মেয়েদের নিয়ে আস্থন!

ঠিক এই সময় সেই গুণ্ডা মত লোকটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবশ্য, বৃষ্টি আর এল না। ঐ তুচার ফোঁটাই পড়ল, ঘাসও ভিজল না। তবে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল।

ইতিমধ্যে দেখি, রামানন্দ ঘনঘন চোখ মুছছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বললাম, তোর হল কি রে? রামানন্দ বলল, মাইরি আমি বুঝতে পারছি আমরা এবারে খারাপ হয়ে যাব। ছি ছি। আমরা সব ভদ্দরলোকের ছেলে, এসব কি কারবার? চল কেটে পড়ি। সিড়িঙ্গে লোকটি একথা শুনে হা হা করে হেসে বলল, কোনো শালা তুনিয়ায় ভদ্দরলোক আছে নাকি আজকাল? ভদ্রতা করলে বাঁচা যায়? তুনিয়াটা এমনি হয়েছে যে ভদ্রতা করেছ কি মরেছ—কিংবা প্রায় শুকিয়ে রয়েছ! হা-হা, অনেক দেখেছি আমি জীবনে।

রামানন্দ বলল, তুই থাকতে চাস থাক, আমি চললাম! বলে উঠে দাঁড়াল। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এই রামানন্দ, এসব কি হচ্ছে—গড়ের মাঠ নিয়ে প্রবন্ধ লিখবি না? এ সবই তো অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা নতুন রকম হলে লেখাও নতুন হবে। কিন্তু রামানন্দ আমার কথায় কান না দিয়ে সোজা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে দৌড়তে লাগল। আমিও তার পেছন পেছন দৌড়তে লাগলাম। বলতে লাগলাম, এই রামানন্দ, এই রামানন্দ, করছিস কি, থাম! থাম!! কিন্তু রামানন্দ আর থামে না। আমার এক-একবার ইচ্ছে করছিল ফিরে যাই—দেখি না মজার কাণ্ড কারখানা। এসব ব্যাপার তো আর রোজ ঘটে না? কিন্তু রামানন্দ আমার কথায় যেন আরো জোর দৌড়তে লাগল—কিন্তু বেচারা জানত না গড়ের মাঠেও কোলকাতার রাস্তার মত গর্ত থাকে। একটা গর্তে পা পড়ে যেতেই

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে কাটা পাঁঠার মত ছটফট করতে লাগল। আমি তখন তাকে সহজেই ধরে ফেললাম। রামানন্দ কাতরাতে লাগল, আমি তার হাঁটুর উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। এক মিনিটের মধ্যে হাজার খানেক লোক আমাদের ঘিরে দেখতে লাগল। কেউ বলল, এক্ষুনি পিজিতে নিয়ে যান দাদা, কেউ বললেন, রিকশো ডাকুন, কেউ বললেন ট্যাক্সি। একজন বললেন, ঠাণ্ডা বরফ! বরফ আবার গরম হয় নাকি? কিন্তু কেউই বললেন না, আসুন আমি গাড়ি করে পৌঁছে দিচ্ছি। তা বলবে কেন, সবাই গড়ের মাঠে এসেছে হাওয়া খেতে।

এদিকে সত্যিই রামানন্দকে কোথাও নিয়ে যাওয়া দরকার। আমার পকেটে পনেরো পয়সা আছে—কোন রিকশাই কোথাও ঐ পয়সায় নিয়ে যাবে না। ট্যাক্সির কথা তো ভাবাই যায় না। রামানন্দ বলল, ট্যাক্সিই ডাক রে, আমি পয়সা দেব।

বুঝলাম ব্যাটার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ হাঁটুতে আঘাত পেলে তার মাথা খারাপ কি করে হয় আন্দাজ করতে পারলাম না। বললাম, কেউ একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন না দয়া করে? ভাবলাম, হক রামানন্দর মাথা খারাপ—যদি দরকার হয় পাড়ার মোড়ের বিড়িওলা সাধু বসাকের কাছ থেকে টাকা ধার করে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দেব। কিন্তু কেউ ট্যাক্সিও ডেকে দেয় না। একজন বললেন, এখানে ট্যাক্সি কোথায়? চলে যান চৌরঙ্গীতে। আমি হাঁ করে থাকতে তিনি বললেন, চৌরঙ্গী কোথায় জানেন না মনে হচ্ছে? হ্যা-হ্যা—বলে কোথায় চলে গেলেন। আমি রামানন্দকে বললাম, হাঁটতে পারবি? রামানন্দ সেকথায় হু হু করে কেঁদে উঠল। আমি তখন তাকে আস্তে করে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলাম। বেচারার পায়ে লেগেছে খুবই। হাঁটুটা খুব ফুলে গেছে। রামানন্দ দাঁড়িয়ে উঠতেই লোকেরা আর বিশেষ তামাশা হবে না বুঝতে পেরে কে কোথায় চলে গেল। আমার উপর রামানন্দ ভর দিল, আর আমি এক পা এক পা করে ট্রাম লাইনের দিকে ওকে নিয়ে যেতে লাগলাম।

একটু যেতেই দেখলাম এক দঙ্গল লোক খুব উত্তেজিত ভাবে কি সব বলছে। মনে হল একটা পকেট মার ধরা পড়েছে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার দাদা? ব্যাপার আর কি, ছেলে ধরা। একটা বুড়ো তিনটি কচি মেয়েকে আইসক্রিম খাওয়াচ্ছিল আর ধীরে ধীরে গড়ের মাঠের ভেতর নিয়ে যাচ্ছিল। বুড়ো বলছিল, একজায়গায় গেলে আরো আইসক্রিম দেবে। বস্তির মেয়ে টেয়েরা সব—ভিক্ষে করে রোজ, বয়স পাঁচ ছ বছর হবে কিনা সন্দেহ। একটি মেয়ে কেঁদে ওঠে ভাগ্যিস, তাই ধরা পড়ে গেছে। আমি রামানন্দকে পথের এক ধারে বসিয়ে রেখে ভীড়ের মধ্যে দেখে এলাম—হ্যাঁ সেই বুড়োই বটে। খুব মার খেয়েছে—এখন লোকেরা আর উৎসাহ পাচ্ছে না। আমি যে ওকে চিনতে পেরেছি তা বুঝতে না দিয়ে রামানন্দকে নিয়ে এক পা এক পা করে এগুতে লাগলাম। ইতিমধ্যে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, রামানন্দ, দুপুর রাতে হঠাৎ কুকুর অনেক সময় যেমন করে ডেকে ওঠে, তেমনি করে ট্যা...ক...সি! বলে ডেকে উঠল। আর ট্যাক্সিটাও দিব্যি পোষা কোনো জানোয়ারের মত থেমে পড়ল। রাগ হল রামানন্দর ওপর—আর দুতিনশো গজ গেলেই ট্রাম পেয়ে যেতাম। বড়লোকী কারবার আমার একদম পছন্দ হয় না।

ট্যাক্সিতে উঠতই আমি শ্যামবাজার বলতে যাব, আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রামানন্দ একটা বড় হোটেলের নাম করল। আমি বললাম, পাগলা নাকি? ড্রাইভারকে বললাম, শ্যামবাজারে নিয়ে চলুন। রামানন্দ বলল, না শ্যামবাজার নয়। আমি বললাম, পয়সা কোথেকে পাবি? রামানন্দ বলল, সে তোকে ভাবতে হবে না।

আমরা সেই দোকানের সামনে দাড়ালাম। রামানন্দ একটা দশ টাকার নোট দিল। ট্যাক্সি ড্রাইভার সাত টাকা কয়েক পয়সা ফেরত দিল। আমরা সিগারেটের দোকান থেকে কুড়িটা সিগারেট কিনে দোকানে ঢুকলাম। আমি বেশ ভক্তির সঙ্গে

বললাম, তোর পা-টা আগে কোনো ডাক্তারকে দেখালে ভাল হত যেমন ফুলে টুলে গেছে!

রামানন্দ বলল, ক্ষিদে—বুঝলি হরিদাস, ক্ষিদে। আগে ক্ষিদের শান্তি হক। ছ' বছর আগে এই দোকানে খেয়েছিলাম, তপেশ আমেরিকা যাবার আগে খাইয়েছিল।

একটা টেবিল দখল করে বসলাম। ছোট্ট ঘর—আমি জিজ্ঞেস করলাম, টাকা কোত্থেকে তোর হঠাৎ জুটে গেল বলত? রামানন্দ বলল, শোন তবে বলি—ঐ যে প্রথম লোকটা আমাদের কাছে এসে কি সব আজ্ঞে বাজে বলছিল, ওর ব্যাগ থেকে সরিয়েছি। ও ব্যাটা দেখতে পায়নি—গল্পে মশগুল ছিল।

আমি একথা শুনে যাঁহা নয় তাঁহা বলে রামানন্দকে গালাগাল করতে শুরু করলাম। বললাম, তোর এতটা অধঃপতন হবে আমি কখনো ভাবিনি। তোর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখা যাবে না, বুঝলি?

অথচ অতখানি ধমক দেওয়া আমার উচিত হয়নি। রামানন্দ এমন ছিঁচকাঁদুনে, মাঝে মাঝে মনে হয় ও বোধ হয় পুরুষই নয়—ওর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়তে লাগল। আমি বললাম, ঠিক আছে, একবার খারাপ কাজ করা হয়ে গেছে, কিন্তু আর কখনো এসব কারবার নয়।

রামানন্দ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, শোন্, আমি দেখি কি ওর ব্যাগে থরে থরে সব দশ টাকার বাণ্ডিল—তা থেকে মাত্র তিন বাণ্ডিল নিয়েছি। তার বেশি নিতে ভরসা হয়নি।

—তিন বাণ্ডিল দশ টাকার নোট! দেখি দেখি!

দেখলাম ওর দুটো পকেটে সত্যিই তিন বাণ্ডিল নোট। রানানন্দ বলল, ঐ লোকটা একটা বাণ্ডিল থেকে কিছু নোট বার করেছিল তাই একটা বাণ্ডিলে কিছু নোট কম আছে। হিসেব করে বললাম, প্রায় তিন হাজার টাকার ব্যাপার!

তখন আমার একটু একটু ভয় করতে লাগল। এতগুলো

টাকা, তাও আমার পকেটে নয়, রামানন্দর পকেটে। এক সঙ্গে নানারকম ভয়—যদি রামানন্দ ভাগ টাগ না দেয়? আরো চিন্তা এত টাকা কোথায় রাখব, এত টাকা দিয়ে কি করব?

এমন সময় বেয়ারা এসে হাজির। বেয়ারাকে রামানন্দ বেশ পরিপাটি একটা অরডার দিল, হিসেব করে দেখলাম চল্লিশ টাকার কম হবে না। তারপর বলল, দো বোতল বীয়ার লাও!

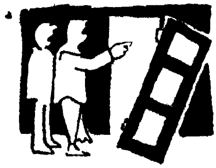
আমি তো হাঁ। বললাম, না বীয়ার নয়, গন্ধ হবে। রামানন্দ তা শুনে খেঁকিয়ে উঠল। বলল, বড়লোকদের ভয় পেতে নেই, আমরা এখন বড়লোক।

আমি আস্তে আস্তে বললাম আমাকে ভাগ দিবি ত?

রামানন্দ বলল দেব দেব ঠিকই দেব। দেওয়া উচিত নয় অবশ্য, তুই তো কিছুই রিসক নিসনি। যাই হক অর্ধেক ভাগই পাবি। আমরা তারপর এই টাকা দিয়ে একটা ব্যবসা ট্যাবসা করব।

খাওয়া দাওয়ার পর আমার মাথাটা একটু একটু টলছিল। রামানন্দ ছটি নোট বেয়ারাকে দিয়েছিল মনে আছে। তারপর বেয়ারা এক মিনিট পরে ফিরে আসে। তারপর গম্ভীর ভাবে বলে এসব নোটের নম্বর এক—এসব জাল মনে হচ্ছে ঠিক নোট দিন। তার গলার আওয়াজটা বেশ কঠিন শোনায়।

আর তার পরই আমার মাথাটা আরো ঘুরে যায়—কেমন কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়, আর পৃথিবীটা ঘুরতে থাকে, আরো ঘুরতে থাকে। একটা হাসির আওয়াজ যেন কানে আসে, অনেক হাসির আওয়াজ…।



চোর নয়

"এইটিই একমাত্র দরজা ?"

"একমাত্র।"

"হুঁম !" বললেন নবকৃষ্ণবাবু। তারপর ঘড়ি দেখলেন। তারপর বললেন, "অর্থাৎ, আপনার সুটকেস ভেঙে যে দেড় শো টাকা চুরি গিয়েছে—সে যে করেই যাক, এই দরজা দিয়েই ঢুকেছে এবং বেরিয়েছে ?"

অমর বলল, "তাই তো দাঁড়াচ্ছে। যদি না বাড়ির কেউ…।"

নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "বাড়ির কেউ মানে আপনি, আপনার স্ত্রী, বাড়ির চাকর গুণমণি—এই তো তিনজন। তাহলে ধরেই নিচ্ছি আপনি চুরি করেননি।"

অমর বলল, "সে তো স্বতঃসিদ্ধ। আমি চুরি করলে আমি এমন হৈ হল্লা বাঁধিয়েছি ? তাছাড়া নিজে কেউ নিজের টাকা চুরি করে ?"

নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "করে না মানে, আলবত করে। হাজার বার করে।"

অমর আশ্চর্য হল। বলল, "হাজার বার করে ? কেন করে ?" কথাটা তার বিশ্বাস যেন আর হচ্ছিল না।

নবকৃষ্ণবাবু পুলিস অফিসে কেরানীগিরি করেন। অমর যখন

অফিস থেকে বাড়িতে এসে দেখল তার স্ত্রী মনোরমা টাকা হারিয়েছে বলে হৈ চৈ করছে, ঠিক তখনই নবকৃষ্ণবাবু এসে হাজির হলেন। তিনি এই পাড়াতেই দু তিনটি বাড়ির পরেই থাকেন। তাঁকে ডাকা হয়নি, কিন্তু তিনি এলেন। নেহাত কর্তব্যবোধেই এলেন।

নবকৃষ্ণবাবু একটু বাঁকা হাসলেন।

বাঁকা হাসি বন্ধ করে বললেন, "আপনি জগতের কিছুই জানেন না বলে বোধ হচ্ছে। লোকে নিজের টাকা নিজে চুরি করে, দুটো কারণে —প্রথমত সে এমন কিছুতে টাকা খরচ করতে চায়, যা কাউকে জানাতে চায় না। দুই, অন্যের নামে দোষ ফেলবার জন্য। ধরুন, টাকাটা আপনি নিজে মেরেছেন—এই, কথার কথা বলছি। আপনার উদ্দেশ্য আপনার স্ত্রীকে জব্দ করা। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া বাধানোই আপনার উদ্দেশ্য। ধরুন গিয়ে আপনার এক বান্ধবী আছে—পুরনো বান্ধবী যাকে আপনি বিয়ে করতে চান, তাই স্ত্রীর নামে বদনাম দিতে চান।"

অমর বলল, "এসব কি বলছেন যা-তা ?"

নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "আমি তো বলেছি, ধরুন। সত্যি সত্যি ঘটেছে তা তো বলিনি। আমি এরকম ঘটনা দেখেছি কিনা অনেক, তাই বলছি। সেই তো পদ্মপুকুরের সেই কেসটার কথা ধরুন। স্বামী স্ত্রীর সমস্ত গয়না চেনা চোর দিয়ে চুরি করিয়ে দিল। বারো হাজার টাকার গয়না। দরজা খুলে দিয়েছিল রাত্রে নিজেই। গয়নাও বোধ হয় নিজেই বার করে দিয়েছিল—কে জানে। যাই হক, পরে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে গোলমাল হয়। লোকটি শেষে চোরের হাতে আচ্ছা মার খায়। হাসপাতালে যখন যায়, তখন তার প্রাণ প্রায় নেই। বাঁচবে না এই ভেবে সে সমস্ত কথা বলে দেয়। রেস খেলা আর মদ খাওয়ার সেই পুরনো ইতিহাস। পরে অবিশ্যি বেঁচে ওঠে। এখন আর পাড়ায় মুখ দেখাতে পারে না।"

একটু হেসে নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "হয় মশাই, হয়। হবে না কেন ? হরদম হয়।"

অমর ভাবছিল, লোকটিকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলবে কি না। একে মনোরমার সঙ্গে তার আজকাল হরদম কথা কাটাকাটি হচ্ছে। এইসব শুনে সে আবার ভেবে না বসে যে, সেই বোধ হয় চুরি করেছে।

নবকৃষ্ণবাবু কিন্তু বসেই রইলেন। বললেন, "আপনার অ্যালিবাই আছে?"

অমর বলল, "অ্যালিবাই আবার কি?"

নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "দেখুন, যদি প্রমাণ হয় যে, যখন টাকা চুরি গেছে, তখন আপনি বাড়িতে ছিলেন না, তাহলে স্পষ্ট প্রমাণ হবে আপনি নিজে চুরি করেননি।"

অমর একটু রাগত কণ্ঠেই বলল, "আমি তো বলছিই আমি টাকা চুরি করিনি।"

নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "একজন তো করেছে নিশ্চয়। কেউ না কেউ করেছে। তাতে তো ভুল নেই?"

অমর বলল, "আমি করিনি জেনে রাখুন।"

মনোরমা সমস্ত শুনছিল। সে বলল, "তুমি বরং পুলিসকে একটা খবর দাও, আর ওঁকে যেতে বলো।"

নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "পুলিসে কি করবে? পুলিস কি ম্যাজিক জানে নাকি? পুলিস আসবে, এসে সব শুনবে, তারপর জিজ্ঞেস করবে কার ওপর সন্দেহ হয়। তারপর তা শুনে চলে যাবে। যদি বলেন, চাকর চুরি করেছে তো তাকে ধরবে। কিন্তু প্রমাণ কই? চাকর ছাড়া পেয়ে যাবে, আর তখন এ বাড়িতে সে চাকরি করবে ভেবেছেন? মাঝখান থেকে চাকরটাকেই হারাবেন। আজ-কালকার বাজারে একটা চাকর পাওয়া বাড়ি পাওয়ার চাইতেও কঠিন।"

অমর একটু ভাবল। তারপর বলল, "বুঝতেই তো পারছেন আমাদের বাড়িতে তিনজন লোক—তবে চাকরটার ওপর সত্যি কোনো সন্দেহ হয় না। বয়স বছর দশ। টাকার মর্মও কিছু বোঝে না। তা ছাড়া ওর কেউ নেই। বাড়ি থেকেও বেরোয় না। আর তা ছাড়া

আমরাও চুরি করিনি। অতএব কাজটা বাইরের লোকেই যে করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "বাড়ির বাইরে রয়েছে তিন শো কোটি লোক! খবরের কাগজে দেখেছেন—আর একশো বছর পরে পৃথিবীতে দাঁড়াবার মতো জায়গাও মানুষের জুটবে না। যাই হক, বাইরের লোক বললে তো হবে না—কার ওপর সন্দেহ হয়?"

অমর বলল, "সন্দেহ কার ওপর করি বলুন?"

মনোরমা ফিসফিস করে বলল, "আমার কিন্তু বাড়িওলার ওপর....।"

নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "চট করে বলবেন না—কিছু প্রমাণ না থাকলে ওসব কথা বলা ঠিক নয়।"

মনোরমা বলল, "বলব না কেন? আমরা কি তার খাই না পরি? দেখছেন তো দুখানা ঘর। এরই ভাড়া দেড়শো টাকা। জলের জন্য এর ওপর মাসে দশ টাকা বেশি দিতে হয়। গত দু বছর ধরে চুনকাম করেনি। আর কেবল তাই নয়—বাড়িওলার পক্ষে চুরি করা খুবই সোজা। আমাদের রান্নাঘরের দেয়ালে একটা দরজা আছে—সেই দরজা বাড়িওলাদের দিক থেকে খোলা যায়। আমাদের এদিকে কোনো বন্ধ করবার ব্যবস্থা নেই। আসলে কি হয়েছিল বলি—আগে এই একতলায় একটিই ফ্ল্যাট ছিল। এখন তাই ভেঙেচুরে ভাগ করে তিনটে ফ্ল্যাট করা হয়েছে। একটায় বাড়িওলা থাকে। গত বছর দোতলা বানিয়েছে। সেখানেও তিনটে ফ্ল্যাট করে প্রত্যেকটি দুশো করে ভাড়া দিচ্ছে।"

নবকৃষ্ণবাবু হাঁ করে শুনছিলেন। তারপর বললেন, "যেই করে থাক মশাই বাড়িওলা চুরি করেনি। ভেবে দেখুন, অন্য কিছু হয়েছে কিনা। আপনি যখন দুপুরে সিনেমায় গিয়েছিলেন, তখন বাড়িতে কে ছিল? গুণমণি ছিল তো?"

"ছিল।"

"সে বাক্স ভেঙে টাকা মেরেছে—তাতো হতে পারে?"

"তা হতে পারে—কিন্তু আমি দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিলাম।

অতএব বেরতে পারে না। অতএব টাকা এমন লোক নিয়েছে যে বাইরের লোক। এবং আমি বলছি ঐ বাড়িওলারই কর্ম। বাড়িওলাকে ডেকে আনব ?"

নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "কিচ্ছু প্রয়োজন হবে না। আমি বলছি যেই চুরি করুক, এই বাড়িওলা তা করেনি। কিছুতেই করতে পারে না।"

মনোরমা বলল, "তাহলে কে করেছে ?"

নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "তাই তো খুঁজতে হবে। হয়তো কখনোই জানতে পারবেন না কে করেছে চুরি। আর চোর যদি ধরাও পড়ে, তাহলেও দেখবেন আপনার বাড়িওলা চুরি করে নি।"

অমর বলল, "আমাদের বাড়িওলাকে আপনি দেখেছেন ?"

নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "দেখিনি। কিন্তু…"

অমর বলল, "লোকটি বদমাইশ। একটি বৌ কোলকাতায়, আর একটি জলপাইগুড়িতে। প্রথম ছ সাত বছর সেটা কেউ জানত না। লোকটা দু পক্ষকেই বজায় রেখেছে। জলপাইগুড়িতে বছরে বার দুই যায়। চায়ের ব্যবসাও আছে। মশাই, ভেজাল-টেজাল মেশায়। আমি স্পষ্ট কাঁচা চামড়ার গন্ধ পাই মাঝে মাঝে। চামড়ার গুঁড়ো চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে বাজারে চালায়। তা ছাড়া দালালিও করে। রঙের ব্যবসাও করে মাঝে মাঝে।"

নবকৃষ্ণবাবু বললেন, "দেখবেন, আমার কথা সত্যি হয় কিনা। আপনার বাড়িওলা চুরি করেনি।"

এই সময় হঠাৎ বাড়ির বাইরে দেখা গেল বাড়িওলা বেরিয়ে যাচ্ছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ফতুয়া গায়ে। বছর চল্লিশ বয়স হবে।

অমর দুঃখের সঙ্গে বলল, "টাকা যদি চুরি করেও থাকে, তাহলে হয়ত সরিয়ে ফেলল। এখন ওর বাড়ি সার্চ করেও কিছু পাওয়া যাবে না।"

নবকৃষ্ণবাবু হাসলেন। বললেন, "বেশি যায়নি যখন তখন আমার

কথায় বিশ্বাস করুন, একবারইতো ঠকবেন। তবে ঐ বাড়িওলার ওপর সন্দেহ করবেন না।"

ইতিমধ্যে পাড়ায় একটা হল্লা শোনা গেল। বহু লোক একসঙ্গে চিৎকার করছে।

হল্লাটা এসে অমরের বাড়ির সামনে থামল।

একজন লোক একটি বছর পঁচিশেক বয়সের ছোকরাকে দুমদাম কিল ঘুষি মারছে আর বলছে, "চুরি করতে লজ্জা করে না?"

আর সবাই চেঁচাচ্ছে, "অমরবাবু, আপনার টাকা-চোরকে পাওয়া গেছে। প্রোফেসর রাখাল ধরের চাকর চুরি করেছে। চাবিওলাকে ডেকে চাবি তৈরি করিয়ে রেখেছে দু মাস আগে। কম ধড়িবাজ! আজ দুপুরে সুযোগ বুঝে অলক্ষ্যে বাড়িতে ঢুকে সুটকেস ভেঙে চুরি করেছে।"

কথাগুলো নানা লোকের কাছ থেকে শোনা গেলেও বোঝা গেল ব্যাপারটা। আরো শোনা গেল, আজ বিকেলে প্রফেসর ধর দেখেছেন, তাঁর চাকর একটা শার্ট পরেছে। ছত্রিশ টাকা দামের শার্ট! মাইনে পায় কুড়ি। বাড়িতে পাঠায় পনের টাকা। সে অত টাকা কোথেকে পেল জিজ্ঞেস করলে বলে, জমিয়েছি! প্রোফেসরের সন্দেহ হওয়াতে তার বাক্স খুলে আরো সব টাকা বেরুল। তারপর দু চারটে ঘুষি খাবার পর কবুল করেছে—সেই ঐ কাজ করেছে।

অমর এবং মনোরমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। প্রোফেসর ধর ছত্রিশ টাকা দামের জামাটাও পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রোফেসর ধরের চাকরটি এসে একেবারে শুয়ে পড়ল অমর আর মনোরমার পায়ে—কেবলি বলতে লাগল, লোভে পড়ে চুরি করেছিলুম—ভুল হয়ে গিয়েছে, আর করব না। আমাকে দয়া করে পুলিসে দেবেন না বাবু!

ওরা আর কিছু করল না। চলে গেল। পাড়ায় গোলমালের রেশও মিলিয়ে গেল।

তারপর অমর হঠাৎ একটা কাজ করল। সে জামাটা পরে ফেলল। ছত্রিশ টাকা দামের জামা। বলল, "বাঃ বেশ ফিটও

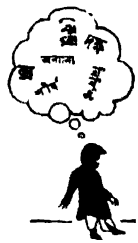
করেছে। বহুদিন থেকে আমারও ইচ্ছে ছিল এমনি একটা জামা করাই।”

মনোরমা বলল, “কি যে করো – ওসব পরে হবে!”

অমর তখন লক্ষ্য করল, নবকৃষ্ণবাবু তখনো চুপ করে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা নবকৃষ্ণবাবু, আপনি কেমন করে অমন দৃঢ়ভাবে বলতে পারলেন, আমাদের বাড়িওলা ও টাকা চুরি করেনি?”

মনোরমা বলল, “বলুন না। সত্যি আমার খুবই আশ্চর্য লাগছে।”

নবকৃষ্ণবাবু একটু গর্বের সঙ্গেই বললেন, “অতি সাধারণ একটা সূত্রেই জবাবটা পেয়েছি। আমি যখনই শুনলাম, বাড়িওলা এই দুখানা ঘরের ভাড়া একশো পঞ্চাশ নেয়, যার ভাড়া হওয়া উচিত পঞ্চাশ টাকার এক আধলা বেশি নয়, যে জলের জন্য আবার দশ টাকা নেয় মাসে, যে চায়ে ভেজাল মেশায়,···সে···কখনো···কখনো চুরি করতে পারে না। কারণ স্পষ্টতই সে ডাকাত!”



পূজা সংখ্যা বনাম প্রেস

রাস্তায় দেখি আমাদের পাড়ার একটি প্রেসের ম্যানেজার দ্বিজেনবাবু কি সব আপন মনে বকছেন। দূর থেকে তেমন শোনা গেল না, তাই কাছাকাছি গেলাম। তখন শুনতে পেলাম দ্বিজেনবাবু বলছেন, দুশো "র্জ" ছশো "ং" একশো "ণ্ড" দুশো "র্ক"। আমি বললাম, "দ্বিজেনবাবু আপনি কি বলছেন, আপনার হল কি ?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "এই তো, মাটি করে দিলে সব। আমি সব এক এক করে ভাবছিলাম, আর তুমি এসে সব গুলিয়ে দিলে!"

আমি বললাম "কি ভাবছিলেন আপনি ?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "ভাবছিলাম লোকে দুমুঠো খাবার জন্য কত কি করে।"

বললাম, "তবে আপনি র্জ, ং, ণ্ড, র্ক, এ সব কথা কি বলছিলেন ? ও সবের কোনো মানে হয় ?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "মানে হবে না কেন—বুর্জোয়ার র্জ, পিকিং এর ং, লণ্ডনের ণ্ড, আর নিউ ইয়র্কের র্ক, কিন্তু এতে তো হবে না। ং আরো বাড়াতে হবে।"

আমি বললাম, "ঠিক বুঝতে পারছি না।"

৮

দ্বিজেনবাবু বললেন, "ওয়াশিংটনের ং এসে যাবে। আরো ং এর দরকার হবে।"

আমি বললাম, "ওয়াশিংটনের ং এসে যাবে কেন?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "ং ছাড়া ওয়াশিংটন আপনি কি দিয়ে লিখবেন? তা ছাড়া এবং এর ং আছে। ছশোয় কুলোবে কিনা সন্দেহ।"

আমি বললাম, "ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?"

দ্বিজেনবাবু আমার কথা বোধহয় শুনতেই পেলেন না। তিনি বলতে লাগলেন, "এর পর আছে আবার হংকং, ইয়াংসিকিয়াং। হাজার খানেক ং দরকার।"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "আর বলোনা ভাই। এই আমার ব্যবসা। পুজোর সময়ে পত্রিকা ছাপিয়ে যা হয়, বছর প্রায় চলে যায়। তারপর কাজ পাই না তা নয়, কিন্তু সে সব টাকা আটকে থাকে—বহুদিন তাগাদা দিতে হয়, তাই আমাদের চেষ্টা এই যে, যত বেশি সম্ভব পুজো সংখ্যার পত্রিকা ছাপি। কিন্তু ছাপাতে গেলে টাইপ কিনতে হয়—নিজে তো টাইপ বানাই না। কিছু কিছু টাইপ অবশ্য মজুদ থাকেই—কিন্তু হঠাৎ এক এক টাইপের বেশ দরকার হয়ে পড়ে! তখন হঠাৎ সেরকম টাইপ না পেলে কাজের ক্ষতি হয়। তাই হিসেব করছিলাম, এবারে কি টাইপ বিশেষ প্রয়োজন হতে পারে!"

আমি বললাম, "ও, বিশেষ টাইপের কথা ভাবছিলেন বুঝি?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "হ্যাঁ ভাই, ভাবছিলাম। কত রকম যে এর হিসেব আছে তার কি সীমা আছে? পুজো সংখ্যা যখন, তখন সুন্দর, শক্তি, ভক্তি এসব কথার বান ডাকবে। অতএব এক মাস আগে থাকতেই আমি ন্দ, ক্ত, এসব জমিয়ে রেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে হয় ঐ কমিউনিস্টদের বেলায়। ওরা আমাকে দিয়ে মাঝে মাঝে কাগজ ছাপিয়ে নেয়—কি করি, ব্যবসার খাতিরে সবাইয়ের সঙ্গেই ভাবটাব রাখতে হয়।

কিন্তু ওদের ঠিক থাকে না সব সময়। কত ফর্মা হবে, কে লিখবে, এক বই ঘন্টায় ঘন্টায় পালটে যায়, কিন্তু ওরা টাকা দেয় ভাল—ওদের জন্য 'র্জ' কিছু রাখি। রাখতেই হয়।"

"কেন?"

"বুঝলে না? ওরা প্রবন্ধ লিখলেই বুর্জোয়া কথাটা ব্যবহার করবেই। প্রতি তিন লাইনে একটা বুর্জোয়া। ষোল পাতার ফর্মা, ওখানেই চলে গেল আটচল্লিশটা র্জ, অন্তত তিন চার ফর্মার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়, তাই শ দুই র্জ আনতে হবে, তাই ভাবছিলাম। এ গেল এক্সট্রা—আমার র্জ একেবারে নেই তা নয়। কবিরাও র্জ তো কম ব্যবহার করে না!"

"কবিরাও? ওরাও কি কমিউনিস্ট?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "সব কবিই যে কমিউনিস্ট তা নয়—তবে মোটামুটি আমার ধারণা, অধিকাংশই কমিউনিস্ট, নইলে ওরা প্রায়ই জর্জর হয় কেন? কবিতা পড়লেই দেখবেন কবিরা বেদনায় ধুঁকছে। অধিকাংশই জর্জর।"

"আর আপনারও র্জ এর প্রয়োজন বেড়ে যায়?"

"প্রয়োজন আরো অনেক কারণে বাড়ে। আরে সেবার সমস্ত লেখা কম্পোজ হয়ে গিয়েছে—একদল এসে বলল একটা পুস্তিকা ছাপাবে—ষোল পাতার। লিখবে তারাপদ।"

"ঐ যে রেস্তোরাঁয় বেয়ারাগিরি করে সেই?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "সেই তারাপদ। ওর দেশ ভক্তি এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে কিছু ছাপতে না পারলে ও ঠিক থাকতে পারছে না। আমি ভেবেছিলাম ও যখন লিখবে তখন খুব বিরাট কিছু হাঙ্গামা বাধাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি তর্জন গর্জন!"

"তর্জন গর্জন?"

"ভারি তর্জন গর্জন। অসম্ভব তর্জন গর্জন। দেশে নাকি কালো বাজারী কুমির আর টাটা বিড়লার উৎপাত সুরু হয়েছে, যে জন্য দেশ

দুর্বল হয়ে পড়েছে, এই সব বড় বড় বাক্ত মশাই। তারাপদ যে আমাকে ডোবাবে ভাবিনি!"

"আপনাকে তারাপদ ডুবিয়েছে?"

'মশাই, ওর জন্য সেবার একটি ফর্মায় দেড়শো র্জ লেগেছিল!"

"দেড়শো?"

দ্বিজেনবাবু আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, "দেড়শো। প্রথম দুপাতা ধরে তো বিদেশী জিনিস বর্জন সম্বন্ধে বিরাট বক্তৃতা। তারপর বৈপ্লবিক কথাবার্তা—সার্জারি কথাটা ব্যবহার করলো পঁচিশবার। তাও ভাল অস্ত্রোপচার করেনি—তাহলে যেতাম।"

"অস্ত্রোপচার করলে আপনি যেতেন কেন?"

"অস্ত্রোপচার করলে কেউ বাঁচে? যাই হক্—সে কথা ঠিক নয়। আমার স্ত্রী মাত্র দশটা ছিল শেষ মেষ।"

"শেষ মেষ কেন? এর আগে স্ত্রী খুব ব্যবহার করে ফেলেছিলেন বুঝি?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "আমি ব্যবহার করব কেন? এইটুকু পুচকে মেয়ে—হারুদার মেয়ে চপলা, সে পাড়ায় ম্যাগাজিনে স্ত্রী স্বাধীনতা নিয়ে এক পেল্লাই প্রবন্ধ লিখেছিল, বাস আমার স্ত্রী খতম। এবারে প্রচুর স্ত্রী মজুদ রেখেছি ফিডেল কাস্ত্রোর জন্য।"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "না। স্ত্রী স্বাধীনতা হয়ে গেছে। আর বোধহয় প্রয়োজন হবে না।"

বললাম, "শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় ভাবছেন স্ত্রী স্বাধীনতা এসে গেছে?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "না তা নয়, কয়েক মাস আগে চপলার বিয়ে হয়ে গেছে। ভাল বিয়ে হয়েছে। বাবা দেখে শুনে পাত্রটি যোগাড় করেছিলেন ভাল।"

আমি বললাম, "জানি।"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "প্রেসের কাজে বড় ঝনঝাট মশাই। আমরা কয়েকটা দ্ব রাখি। সেবারে আমাদের প্রেস থেকে একটি নতুন লোক

হুঁ চুরি করে সরে পড়ল। দু'সের হুঁ ছিল মশাই। অত ভাল হুঁ কি আর পাব? সেই ইংরেজ আমলের হুঁ। ভাল হুঁ মশাই!"

"দূর মশাই, কি বলছেন?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "হুঁ মশাই বলেছি। দূর মশাই বলিনি।"

"কিন্তু আমি শুনলাম যেন..."

"ভুল শুনেছো।"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "কত আর বলব। বেশি টাকা নেই যে একটা ফাউণ্ড্রি বানাই। তাহলে কি আর এই পচা প্রেসের কাজ করতে হয়? রাজার হালে বসে বিন্দু বানাও, বিসর্গ বানাও, চন্দ্রবিন্দু দেওয়া যতো রকমের অক্ষর বানাও। সেরকম কাজ করে সুখ আছে মশাই, সুখ আছে। কিন্তু প্রেস চালানোর মত বদ কাজ আর নেই।"

বললাম, "তবে যে শুনি সম্পাদকদের মত বদ কাজ আর হয় না?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, 'ভুল। ভুল শুনেছ।"

বলতে না বলতেই চলতি একটা ট্রামে উঠে পড়লেন।

হঠাৎ কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। এমন সময় দেখি প্রিয়ব্রতবাবু দৌড়ুতে দৌড়ুতে একটা থামের আড়ালে গেলেন, আর সেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগলেন।

বললাম, "ও প্রিয়ব্রতবাবু, হল কি?"

প্রিয়ব্রতবাবু একজন লেখক। তাঁর দু'খানা বই সিনেমাওয়ালা কিনেছে, আর দু'খানা বই পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে—বিরাট নামকরা লোক।

আমি গিয়ে বললাম, আবার—"ও প্রিয়ব্রতবাবু, হল কি?"

প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, "দড়ি বেয়ে নেমে এলাম।"

"আপনি তো তেতলায় থাকেন? সেখান থেকে দড়ি বেয়ে নেমে এলেন?"

"নেমে এলাম।" তিনি বললেন।

"কেন? পুলিস?"

প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, "পুলিস হলে মশাই হাসিমুখে দাঁড়ানো যায়। এক সম্পাদক দেখা করতে এসেছিলেন।"

"কেন?"

"মশাই, আর বলবেন না। উপন্যাস দেব বলেছিলাম—দিয়েছি, কিন্তু ভুল করে, নেহাত ভুল করে একটা ছোটগল্পও ওর মধ্যে চলে গিয়েছে—সে গল্পটা অন্য একটি কাগজের জন্য লিখেছিলাম। এখন মুশকিল হয়েছে কি, এরা তো আমার উপন্যাসের মধ্যে ছোটগল্পটা ছেপে দিয়েছে—ছাপা হয়ে গিয়েছে—আর উপায় নেই—কি রকম অসংলগ্ন ব্যাপার বুঝতেই পারছেন। তাই আর কি, সম্পাদকের চাকরি যায় যায়। এখন তিনি একটা পকেট হাতুড়ি নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, তাই দেখেই দড়ি বেয়ে নেমে এসেছি?"

"দড়ি বেয়ে! দড়ি কোথায় পেলেন?"

"বহুদিন আগে থেকেই দড়ির খেলা সুরু করেছি। গোলমাল তো আজ নতুন হল না। একবার একটি ছোট গল্প লিখেছিলাম, তার নাম দিয়েছিলাম 'ভুবন তো আজ হল কাঙাল'। বাস্ আমার প্রাণ অতিষ্ঠ!

"কেন?"

"মাসিক পত্রের মালিকের নাম ভুবন জানতাম না। শেষ পর্যন্ত নাম বদলে দিতে বাধ্য হলাম!"

"কি নাম দিলেন?"

"সুবীর তো আজ হল কাঙাল!"

"কেল্লা ফতে?"

"না। শেষ পর্যন্ত আর্টিস্ট হেডপীস করল, 'সুবীর তো আজ হল বাঙাল'! কেউ লক্ষ্য করেনি। যখন ছাপা হল তখন মালিক বললেন সম্পাদককে, 'এ কিডা লিখছে?' বুঝুন ঠ্যালা সম্পাদক দুজন গুণ্ডা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ দড়ির খেলায় বেঁচে গিয়েছিলাম।"

আমি ভাবছিলাম পূজো সংখ্যার লেখকের দুরবস্থার কথা। জিজ্ঞেস করলাম, "এবারে কতগুলো লিখছেন ?"

প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, "সাতখানা উপন্যাস, পোনেরটা গল্প আর ছটি কবিতা।"

"কবিতা ?"

"কবিতা লিখতে পারি জানতাম না। একবার একটি সম্পাদক আমাকে লেখার জন্য চিঠি লিখলেন, পঁচিশ টাকা দেবেন একটি পূজো সংখ্যার গল্পের জন্য। আমি লিখলাম: ভাই, কি করে লিখি। টাকাও তো বেশি নয়। জামা কাপড় ইত্যাদি বাবদ যা খরচ হবে তার জন্য পঁচিশ টাকা অতি সামান্য নয় কি ? পঞ্চাশ হলে দেখতে পারি। ইতি।

তারপর আর কোন সাড়া নেই। দেখি ওরা কবিতা বিভাগে ঐ চিঠিটিই ছেপেছে—

ভাই,
গল্প কি করে
লিখি ?
টাকাও তো বেশি নয়।
জামা কাপড়
        ইত্যাদি বাবদ
যা খরচ হবে তার
জন্য পঁচিশ
টাকা অতি
সামান্য।
নয় কি ? পঞ্চাশ হলে
        দেখতে পারি।

তারপর থেকে কবিতাও লিখতে স্বরু করেছি।

বললাম, "কিন্তু অতগুলো উপন্যাস লেখা কি কম পরিশ্রমের ?"

প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, "বড় উপন্যাস তো লিখিনা। ঐ এক -একখানা দশবারো পাতার উপন্যাস লিখি।"

আমি বললাম, "অত ছোটকে উপন্যাস বলেন কেন?"

প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, "এককালে যেগুলোকে রসমুণ্ডি বলা হত, তার নাম আজকাল রসগোল্লা হয়েছে, দেখেছেন?"

"হ্যাঁ"

"এও তাই। শুনছি দু একজন বড় ঔপন্যাসিক তিন পাতার উপন্যাসও লিখতে লেগে গিয়েছেন।

তারপর প্রিয়ব্রতবাবু দেখলেন দূরে। কে যেন চলে যাচ্ছে। তারপর বললেন, "আজ আসি?"

বললাম, "যান, আপনার কাজ পড়ে রয়েছে!"

প্রিয়ব্রতবাবু চলে গেলেন।

খানিকপর দেখি দ্বিজেনবাবু ফিরছেন রিকশোয় করে। আমাকে দেখে রিকশো থামালেন। বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে, সব পেলাম কিন্তু ং আর পেলাম না। খুব কাটতি হয়েছে ঐ ং এর। ভারত তিব্বত আর চীন সীমান্ত নিয়ে সব পত্রিকাতেই ছুটো করে গড়ে প্রবন্ধ যাচ্ছে।"

বললাম, "এবারে তাহলে কি করবেন?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "এবং গুলো কেটে ও করব। আর কিছু কিছু ঙ দিয়েও কাজ চালাব। চালাতেই হবে! উপায় কি?"



অন্ধকার নেমে আসছিল

আমার দোষ—যখন সুরেশ, নিতাই আর বিষ্ণু চাকরির দরখাস্ত আর তদ্বির তদারকি করতে করতে হাত পা আর মুখ ব্যথা করে ফেলে বিপ্লবী হয়ে গেল তখন আমি কেবল বলেছিলাম, এই মাসটা অপেক্ষা করলে হত না? ভাদ্র মাসটা যাক। বিপ্লবী হওয়ার তো অনেক সময় আছে—এমন হুট করে হয়ে পড়লে তেমন ভাল দেখায় না। এইটেই আমার দোষ। কথাটা আমার বলা উচিত হয়নি ঠিকই। অন্যেরা কে কোথায় বিপ্লবী হচ্ছে না হচ্ছে তাতে আমার কি? ওরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারে, কিন্তু সেজন্য আমাকে তার বিরোধিতা করতে হবে এমন কোন আইন কোন শাস্তরেই লেখে না। যাই হক, তারপর থেকে ওরা বিপ্লবী ঠিকই হয়ে গেল, কিন্তু আমি তাদের চোখে হয়ে পড়লাম শত্রু। ওরা বিপ্লবী হয়ে কোথায় খেলতে চলে গেল—পাড়াতে আর দেখা গেল না, শুনলাম বিপ্লব টিপ্লব নিজের পাড়ায় তেমন ঠিক জমে না। তবে তারা যে কলকাতা ছেড়ে কোথাও যায়নি সেটা বোঝা গেল সেদিন। সেদিন আকাশে কালো কালো মেঘ—কতকগুলি মেঘ এদিক ওদিক করছে, কতকগুলি মেঘ আবার চুপচাপ, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। দু একটা ক্ষুদে মেঘ খিলখিল করে হাসছে—তা দেখে বড় বড় দু একজন অভিভাবক শ্রেণীর মেঘ গম্ভীরভাবে তাদের ধমক দিচ্ছে। আমি দূরে

আকাশবাণী ভবনের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, ঠিক তার উপর বিরাট একটা মেঘ গণ্ডার সেজে হম্বিতম্বি করছে। এদিকে সূর্য ডুবে গেল দিগন্তের আড়ালে। আজ সারাদিন সূর্য মেঘের আড়ালে আড়ালেই ছিল, কালও তাই। এই কারণে সূর্যের পাবলিকের কাছে দেখা দিতে আজ আর মেক-আপ টাপের দরকার হয়নি। আমি চুপ-চাপ বসেছিলাম, যুববাণীতে অংশ গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করতে আজও এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম। অবশ্য, একেবারে ব্যর্থ হয়েছি বললে ভুল হবে। একজন কর্তাস্থানীয় ব্যক্তির বন্ধু আমার চুল দেখে বললেন, এখনো পাক ধরেনি, আমার দাঁতে গুঁতো মেরে বললেন, এখনও একটা পড়েনি, নড়েনি। আমার পা দুটি দেখে বললেন, এখনও এ দুটি আশি হাজার মাইল চলবার ক্ষমতা রাখে। তিনি বললেন, আশা রাখো ভাই—তোমার সব গুণই আছে, ধৈর্যও আছে কেবল যা তোমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তা তোমার বয়স।

আরও বছর পঞ্চাশ পর ডেফিনিটলি তোমাকে চানস একটা দেবার কথা আমি রেকমেণ্ড করব ভাই, কথা দিলুম। এই শুনে, চোখে নানারকম হলুদ রঙের ফুল দেখতে দেখতে আমি রাগ করে বেরিয়ে এসেছিলাম। তবে আমার ওসব ফুল-টুল দেখা উচিত হয়নি। রাগ করাও নয়। যেখানে সেখানে হুট হাট রাগ করাটা আমার স্বভাবের একটা বড় দোষ, সেদিন এই কথাটা আমার মনে রেখে ঠাণ্ডা থাকাই উচিত ছিল।

সুরেশরা যে কলকাতাতেই রয়েছে, তা আমি আকাশবাণী থেকে বেরুনোর মিনিট পনের পরই টের পেলাম। আমি টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে বসে বসে ভাবছি, এর মধ্যে সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে ঝুলে বিনি টিকিটে বাড়িতে ফিরতে গেলেও ভিজে যেতে হবে। ফার্স্ট ক্লাস ধরে ঝুললেও ঐ একই অবস্থা—এইসব গুরুতর কথা ভাবছি, আর হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করলে কেমন হয়! এই কথাটা মনে হচ্ছে আর আমার দমকে দমকে হাসি পাচ্ছে, কেন কে জানে? লোকে বলে আমার মধ্যে নাকি হিউমার দারুণ রয়েছে। এই সময়

হঠাৎ দেখি কে যেন দৌড়ে আমার দিকে ছুটে আসছে—চিনতে পারিনি প্রথমে। তারপর ছুটে এসে আমাকে ভুম করে মাটিতে চিৎ করে ফেলেছিল যখন সে, তখন স্পষ্ট দেখলাম, লোকটি আর কেউ নয়, সুরেশ। আমার তখন অদ্ভুত অবস্থা। ভিজে ঘাসের সঙ্গে কাদা-টাদাও থাকতে পারে—আমার জামার সঙ্গে কাদার সংযোগ হতে পারে এইরকম দারুণ এক আশঙ্কায় বুক দুরু-দুরু করছে, তার উপর সুরেশের একাত্তর কেজি দুশো বারো গ্রাম ওজন (দু এক কেজি এদিক ওদিক হতে পারে)। ও তখন বলছে, উজবুক ! আজ আমি তোকে নিকেশ করব।

আমি চিঁচি করে বললাম, একটু আলগা দে না মাইরি, আমার জামায় কাদাটাদা লেগে যেতে পারে তো ! সুরেশ একথা শুনে একটা দমকা হাসি হাসতে গিয়ে থেমে গিয়ে তার বড় বড় জুলফি সমেত মুখ-খানাকে আমার মুখের খুব কাছে নিয়ে এল, তারপর যেন খুব ঘেন্না হয়েছে এই রকম একটা মুখভঙ্গী করে বলল, তোর মুখ দেখতেও আমার সর্বশরীর ঘৃণায় রি রি করছে জানিস ? আজ যদি আমার কাছে ছোরাটা থাকত, তাহলে এই গড়ের মাঠে একটা নরবলি হয়ে যেত জানিস ? আর সেই সঙ্গে খতম হয়ে যেত একটা শ্রেণী শত্রু !

আমার মনে হল সুরেশ পাগল টাগল হয়ে গেছে। কি আর করা যায়, এরকম কত হচ্ছে আজকাল ? ওর জন্য আমার খুব দুঃখ হতে লাগল। অবশ্য, তখন আমার নিজের জন্যও দুঃখ হচ্ছে। আমার পেটে বুকে চাপ পড়ছে। আমি বললাম, যা কি হচ্ছে মাইরি, ছেড়ে দে। সন্ধেবেলা আবার টিউশানিতে যেতে হবে। সুরেশ কোন কথা না বলে ওর বুকপকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে একটা সিগারেট লাইটার দিয়ে সেটিকে ধরিয়ে টানতে শুরু করল। আমি তখন চিঁ-চিঁ করে আবার বললাম, তা তোর ছোরাটা সঙ্গে আনলেই পারতিস—না হয় খতমই হয়ে যেতাম। একটু আগেই তো ভেবে-ছিলাম আত্মহত্যা করেই ফেলব।

সুরেশ তখন আমাকে ছেড়ে দিল। পাশে বসে বলল, তোর হাড়-.

গুলি বড় ফুটছে, শালা—গা-টাকে একটু নাদুস-নুদুস করতে পারিসনি, বুর্জোয়া, শ্রেণীশত্রু! খবরদার উঠবি না এখান থেকে। চুপ করে শুয়ে থাকবি। আমার একটু কেমন যেন লাগছে। বুকের মধ্যে কি রকম যেন করছে। এখন তোর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করব না। একটু অন্ধকার হয়ে নিক, তারপর তোকে নিকেশ করব। ছোরা নেই, কিন্তু আমার দুটি হাত আছে, পকেটে দড়ি আছে। মেরে ফেলতে হলে ছোরা না হলেও চলে, তবে কিনা শ্রেণীশত্রুকে খতম করতে হলে একটু রক্ত-টক্ত থাকা দরকার। রক্তপাতহীন বিপ্লবের সঙ্গে আমাদের ফিলসফি খাপ খায় না কিনা!

আমি তখন উদারভাবে বললাম, আজ না হয় থাক এসব, আর একদিন হবে'খন। তাছাড়া কেমন সুন্দর দিনটা বলত? আচ্ছা, তোর ঐ যে ছোরাটার কথা বলছিস, সেটা গেল কোথায়?

এ কথায় সুরেশ রাগে যেন ফুঁসতে লাগল। বলল, দারুণ ছোরা রে, সবে পরশু কিনেছিলাম চার টাকা সত্তর পয়সায়। তারপর কি যেন তার মনে হল, হঠাৎ ফিস ফিস করে বলল, দোকান থেকে পছন্দ করতে করতে ওটাকে দুম করে চাদরের তলায় লুকিয়ে ফেলেছিলাম।

আমি বললাম, তা ওটা গেল কোথায়?

সুরেশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কাল সন্ধেয় মেটেবুরুজে এক শ্রেণীশত্রুর বুকে বসাতে গিয়ে ভুল করে একটা বেরালের পেটে ওটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমি কেমন করে জানব, শালা তার অসুস্থ বেড়ালকে চাদরের তলায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল? আমি ছোরা মারতেই লোকটা মিয়াঁও বলে চিৎকার করে উঠল। আমি তো এতেই কাবু। ঢের ঢের লোককে আমি ছোরা খেতে দেখেছি —কিন্তু কেউ ছোরা খেয়ে মিয়াঁও করে ওঠার ঘটনা আমার জীবনে দেখিনি, শুনিওনি। আর আমি হতভম্ব হয়ে পালিয়ে গেলাম। পরে আবার একটা টর্চ নিয়ে ওদিকে গিয়েছিলাম, আমার ছোরাটা কোথাও পড়ে আছে কিনা দেখতে। ছোরা পাইনি, তবে আমি যে কিভাবে একটা বেড়াল মেরেছি, নিরীহ, গোবেচারা বেড়াল—সেই

ঘটনা শুনে এলাম নিজের কানে। উঃ লোকেরা সে কি যে বাজে বাজে হাসছিল! ইচ্ছে করছিল পটাপট ঐ সব লোকদের শেষ করে দিই! যাই হক—ছোরাটা গেল, তাই আজ তুই বেঁচে গেলি। মানে, এখন পর্যন্ত বেঁচে আছিস আর কি। একটু অন্ধকার হক, তারপর দেখবি মজাখানা।

আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দে মাইরি। পকেটে কিসসু নেই। ভাবছিলাম কেমন করে ট্রামের পাশে ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফিরি। তাছাড়া, তোদের এসব ভুল ধারণা। আমি তোদেরই দলে আসলে। আমিও চাই এই সব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাক। যুববাণী ধ্বংস হয়ে যাক, আকাশবাণীর বারোটা বাজুক। তবে এক্ষুনি নয়, একটু রয়ে সয়ে।

সুরেশ বলল, তুই তো পুলিসের গোয়েন্দা! ভালমানুষ সেজে এখন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদলে তো হবে না। হুঁ হুঁ বাবা—আমরা সব খবর রাখি।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম যেন। পুলিস! পুলিসের গোয়েন্দা? আমি? যাঃ!

সুরেশ বলল, চারদিন আগেকার কথা ভেবে দেখ। আমি শ্যামবাজার থেকে এক ডিমওলার ছদ্মবেশে আটাত্তর নম্বর বাসে ছিলাম। কণ্ডাকটার তোর কাছে এসে টিকিট চাইতে তুই কি বলেছিলি, আমি স্পষ্ট শুনেছিলাম। তুই বলেছিলি, পুলিস! বাস, অমনি কণ্ডাকটর তোর কাছ থেকে কেটে গেল।

আমি বললাম, ও, তা তুই জানিস না বুঝি? ওদিকে তো ট্রাম নেই, তাই ট্রামের পাশ থেকে ঝুলতে পারি না। এই কারণে পুলিস বলতেই হয়। ব্যস! তাহলে আর পয়সা লাগে না। আর তুই ভাবলি আমি বুঝি পুলিসের গোয়েন্দা?

একথা শুনে মনে হল সুরেশের অনুশোচনার মত কিছু একটা হয়েছে। সে মুখখানাকে পোষা খরগোশের মত করল। তারপর সিগারেটে শেষ টান দিল। কিন্তু বিষ্টিতে নিবে গিয়েছিল বলে ধোঁয়া

টোঁয়া কিছু বেরুল না। আমি মনে করলাম, এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম। তাই ওকে আরো ভোলানোর জন্য বললাম, সেদিন তোর সেই সুচিন্তিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রে একটা বাড়িতে। সে বাড়িতে আমি দুটি ছেলেকে পড়াই—ও এসেছিল কি একটা কাজে। তোর কথা জিজ্ঞেস করল।

—সত্যি ?

আমি তখন বুঝলাম সুরেশ নরম হয়েছে। বললাম, সত্যি না তো কি। তারপর বলল, ওকে এটা দিয়ে দেবেন ? বলে ব্যাগ থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করল।

সুরেশ আগ্রহের সঙ্গে বলল, তারপর ?

আমি বোকার মত বললাম, তারপর সুচিন্তিতা আর কিছু না বলে চলে গেল।

—আর তুই কি করলি ?

আমি স্বীকারোক্তি করছি এমন ভাবে বললাম, আমি আর কি করি। বহু দিন ভাল মন্দ খাই না, তাই কফি হাউসে গিয়ে ঐ টাকায় একটা ওমলেট একটা টোস্ট আর ছ' কাপ কফি মেরে দিলাম। তারপর কুড়িটা ভাল সিগারেট কিনলাম, একটা দেশলাইও সঙ্গে। তারপর পাড়ার সিগারেটওলাকে পাঁচ টাকা ধার শোধ করলাম, এগারো কেজি কয়লা কিনলাম।

সুরেশ বলল, আজ তোকে খুন করে ফেললে কত কথা অজানা হয়ে থাকত তাই ভাবছি। তুই যে পুলিস নস, তুই যে বুরজোয়াদের পদলেহনকারী ঘৃণ্য কুক্কুট নস তার প্রমাণ কি ?

আমি বললাম, কুক্কুট নয়, কুক্কুর…

সুরেশ বলল, তা ছাড়া তুই যে কুড়ি টাকা মেরে দিয়েছিস, আমার টাকা, তোর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে ইতিহাসও বিলুপ্ত হয়ে যেত। ভাগ্যিস ছোরাটা ছিল না। কিন্তু তোকে বলি একটা কথা। এ খবর আমি জানি, কিন্তু দুদুবাবু তো জানে না। দুদুবাবু তো তিন-জনকে ভার দিয়েছে তোকে ধরাধাম থেকে পার্সেল করে বাইরে

কোথাও চালান করে দিতে। আমি হলাম সেই তিনজনের একজন। বাকী দু'জনতো এখন তোকে গরু খোঁজা করছে।

আমি বললাম, তাদের মধ্যে একজন বোধ হয় ভোমবল?

সুরেশ এ কথায় চমকে উঠল। বলল, তুই জানলি কেমন করে?

আমি বললাম, আমি স্রেফ আন্দাজ করলাম। সেদিন বিকেলে কলেজ স্ট্রীটে ওর সঙ্গে দেখা। একবার ও আমার বিছানার চাদর ধার নিয়ে তিন টাকায় বেচেছিল, সেই থেকে ওকে আমি এড়িয়ে চলি। আমি ওকে দেখে একটা গলিতে সরে পড়লাম, আর দেখি কিনা ও পেছন পেছন আসছে। আমি তখন হঠাৎ পেছন ফিরে ওর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম, কি ব্যাপার কি অ্যাঁ? ভোমবল তখন বলল, তুমি তেলেভাজা খাবে? আমি তো হাঁ। একজন লোক আমার পেছন পেছন তেলেভাজা খাওয়ানোর জন্য ঘুরছে এটা ভেবে আমার কি রকম অসম্ভব এবং কিম্ভুত মনে হল। কিন্তু সেরকম ভাব প্রকাশ না করে বললাম, তেলে ভাজা? তাতে আপত্তি কি?

তেলেভাজার কথায় পেটে আগুন জ্বলে উঠল। আমি ভোমবলের পেছন পেছন যেতে লাগলাম। ও করল কি—এ-গলি সে-গলি দিয়ে চলতে চলতে প্রায় মৌলালির কাছে এনে ফেলল। আমি বললাম, আর কতদূর? ভোমবল বলল, এই একটুখানি। আমি বললাম, কত তো দোকান পার হয়ে গেলাম। ভোমবল বলল, আমার একটা দোকানে অ্যাকাউন্ট আছে কিনা, সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি। তারপর একটা সরু গলিতে গিয়ে বলল, ও হোসেন দাদু!! ও সুবীরকাকা।

একজন লোক বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট দোকানের ছোট্ট দরজা দিয়ে। সে হোসেন দাদুও হতে পারে, আবার সুবীরকাকাও হতে পারে। কোন কথা না বলে সে একটা স্টোভ জ্বেলে বেগুনী ভাজতে শুরু করল। আর আমি গোগ্রাসে তাই খেতে শুরু করলাম। প্রায় দু' টাকার মত তেলেভাজাই খেয়ে ফেললাম আমি।

—তারপর? সুরেশ জিজ্ঞেস করল।

—তারপর? আমি বললাম, তারপর রাত্রে আমার কলেরার

মত হল। ডাক্তার বলল, ফুড পয়জনিং—সাংঘাতিক ব্যাপার। প্রচুর বমি করলাম, আর প্রায় এক টাকা তেত্রিশ পয়সার মত তেলেভাজা বেরিয়ে গেল। তখনই মনে হল আমাকে হত্যা করবার এক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। তা কলকাতায় তো কত বিষ খাচ্ছি, তাই বোধ হয় বিষ আমাকে কাবু করতে পারল না।

সুরেশ বলল, তুই দু-দুবার বেঁচে গিয়েছিস, তবে যে ভাবে বেঁচে আছিস তাকে কি বেঁচে থাকা বলে? ঠিক মত গভীরভাবে বেঁচে থাকতে হলে টিউশানি করে আর টিউবওয়েলের জল খেয়ে সুন্দরী মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলে না। দেশকে আগে গড়ে তুলতে হবে—তার আগে দেশটাকে ভাঙতে হবে, কেননা, দুদুদা বলেছেন, আগে ভাঙো। এটাই তাঁর স্লোগান।

সুরেশ বলতে লাগল—আমি তখন আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টি আরো জোর আসছে, আর তারই মধ্যে নেতাজী কালো ঝকঝকে মোটা ভারি হাত তুলে দূরে রেস কোর্সের দিকে কি যেন দেখাচ্ছেন। যেন বলছেন, কেটে পড় কেটে পড়। শ্যাম-বাজারেও উনি, বোধ হয় এমন দেশে কে থাকে ভাই, এই সুরের সঙ্গে তাল রেখে উদ্দাম ঘোড়ায় চেপে বসেছেন। কিন্তু তিনি এদিকে দেখাচ্ছেন রেস কোর্সের দিকে হাত, আর শ্যামবাজারে সেই তিনিই অন্য দিকে কেন দৌড়চ্ছেন সেটা আমার বুদ্ধিতে কুলল না। অনেক ভেবেও এর কুলকিনারা আমি পাইনি।

হঠাৎ শুনি যেন ঝড়ের হাওয়ায় একটা গান ভেসে আসছে, কেটে পড় কেটে পড় ভাই, যেও না এগিয়ে মিছে, ল্যাজটা ফুরিয়ে গেছে…কিন্তু কথাগুলি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি তাও হতে পারে, কিংবা হয়তো গানটা ছিল, রে রে ভেলকীওয়ালি! তোর রুমাল রাস্তায় পড়ে গড়াগড়ি খায়!

হঠাৎ মনে হল নেতাজীর প্রদর্শিত পথই আমার পথ। আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। বর্ষার সূর্য সকাল থেকেই ডুবু ডুবু হয়ে ছিল—চার দিক থেকে অন্ধকার নেমে নেমে আসছিল। বহুযুগ

আগে এই গড়ের মাঠে এই সময় ভূতেরা নাচত, গাইত। সায়েবরা সে সব ভূত দেখে গেছেন। এখন সে সব ভূত-দেখা সায়েবরাও কবে মরে গেছেন, কিন্তু তাঁদের ভূতেরাও সব যে যার হাওয়া হয়ে গেছে কেন, সে কথা আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি। যাই হক, সুরেশ যখন ভেবেছিল আমি পালাব না, হঠাৎ আমি ধড়মড় করে উঠে তার কোমরে একটা লাথি দিয়ে ফস করে তার পকেট থেকে কতকগুলি দশটাকার নোট তুলে নিয়ে হুড়দাড় করে নেতাজী প্রদর্শিত পথে রেস কোর্সের দিকে দৌড়ুতে শুরু করলাম। সুরেশ আমার পেছন পেছন আসছে বুঝতে পারছিলাম। একটা লাথিতে তার কিছুই হয়নি। আমি জানতাম আমি হঠকারিতা করেছি, এবারে ও যদি আমাকে ধরে তাহলে রেয়াত টেয়াত করবে বলে মনে হয় না।

এই সময় আমার দম কমে এল। কতই বা দৌড়েছি, এরই মধ্যে দম ফুরিয়ে যাওয়ায় মন বেদনায় ভরে এল। দু-চারটি দেশাত্ম-বোধক গান গলার কাছে এল—যেমন, আগে চল আগে চল ভাই, কিংবা—যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে! কিন্তু গাইতে পারলাম না। এই রকম দৌড়ুতে দৌড়ুতে কি দেশাত্মবোধক গান গাওয়া যায়? রেডিও অফিসের ঠাণ্ডা সুন্দর উজ্জ্বল এবং স্নিগ্ধ আলোয় দু চারটে সঙ্গতের সঙ্গে এই সব গান গাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু সে সব কোথায় পাই? কি করে সুরেশের হাত থেকে এড়াব বুঝতে পারছি না—পা ক্লান্ত হয়ে আসছে, মন অবসন্ন। হঠাৎ দেখা পেয়ে গেলাম প্যাটন ট্যাংকটির। আমার সামনে দাঁড়িয়ে প্যাটন ট্যাংক রইল একটু কাত হয়ে। এইবার আমি মনে একটু জোর পেলাম। হুড়দাড় করে ট্যাংকটির উপরে উঠে ট্যাংকটির কামান তাগ করলাম সুরেশের দিকে। সুরেশ কাছে এসে পড়ল, আমি তখন বললাম, বন্দেমাতরম! কাছে এলেই গুলি, উড়বে মাথার খুলি! সুরেশ তাই শুনে প্রথমে ধপ করে ওখানেই বসে পড়ল। আর আমি তখন হঠাৎ, কেন জানি না, চেঁচিয়ে

উঠলাম, বাঁচাও, বাঁচাও,! এই সময় হুশ করে আকাশে বিদ্যুৎ খেলে গেল, আর ঝুম ঝুম ঝুম করে জোর বৃষ্টি পড়তে লাগল। এই সময় আমি শুনি সুরেশও বলছে, বাঁচাও বাঁচাও! আমি তখন একটু অবাকই হলাম বলা যায়। ট্যাংকের উপর থেকে সুরেশকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই মায়াকান্না কাঁদছিস না তো? বাঁচাও বাঁচাও বলছিস কেন রে? সুরেশ তখন তারস্বরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ভাই বুদ্ধ, তুই আমাকে এখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাবি, আমাকে সাপে কামড়েছে। আমি মরে যাচ্ছি মাইরি। আমি তখন প্যাটন ট্যাংকের কামান ধরে একটু ঝুল দিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়লাম। আমার পা ছ ইঞ্চি কাদায় আটকে গেল, তারপর কোন মতে পা দুটিকে মুক্ত করে সুরেশের কাছে গেলাম। যদিও একটা রিস্ক ছিল—ওকে হয়ত সত্যি সাপে-টাপে কামড়ায়নি, কেবল আমাকে ধরবার জন্য ভান করছে। কিন্তু তবু আমি গেলাম, কেননা সুরেশের গলায় তখন এমন কাতরতা আমি শুনেছি যাকে অমান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। এগিয়ে দেখি সুরেশ ছটফট করছে—আর কাতরাচ্ছে। বিষ্টিতে তার কান্নার আওয়াজ মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছে। আমি বললাম, সাপই তো? সুরেশ বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ সাপ—গোখরো সাপ—শিগগীর তুই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল! বলে অজ্ঞানই বোধ হয় হয়ে গেল।

আমি তখন সুরেশকে তুলে ধরলাম। কিন্তু বিষ্টির জলে কেবলি ও পিছলে যেতে লাগল। কিছুতেই তুলে ধরতে পারছি না। ওকে আমি আস্তে আস্তে কাঁধে করব ভাবছি—নাকি চৌরঙ্গীতে গিয়ে একটা ট্যাকসি নিয়ে আসব? এটাও ভাবছি—কিছুতেই বুঝতে পারছি না কি করব। এমন সময় ভূতের মত তিনটি মূর্তি ঐ বিষ্টির মধ্যে কোত্থেকে এসে বলল, কি প্রেম মাইরী, যেন রাধাকৃষ্ণ! এবার কাছে যা থাকে দিয়ে দাও তো বাপু, বলে একটু খুদে টর্চ ধরল। তারপর যখন দেখল আমরা রাধাকৃষ্ণ নই, তখন তারা একটু যেন

পিছিয়ে গেল। একজন একটু মত্ত অবস্থায় বলল, যাক রাধাকৃষ্ণ অবশ্য তোমরা নও, তবে তোমাদের কাছে যা যা মালকড়ি আছে দিয়ে দাও! আমি তখন ভয়ে ভয়ে বললাম, আমার এই বন্ধুটিকে সাপে কামড়েছে, ওর চিকিৎসা দরকার। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এ কথা শুনে তাদের মনের গুপ্ত কোণ থেকে পরোপকারের প্রবৃত্তি জেগে উঠল। তারা অন্ধকারে কোথায় ছুটে গেল, তারপরই একটা প্রাইভেট গাড়িকে নিয়ে এল। একজন ড্রাইভারের পিঠে একটা ছোরা ধরে ছিল, সেটা অবশ্য পরে দেখতে পেলাম। সুরেশকে তারা গাড়ির মধ্যে ঢোকাল, তারপর আমাকে। সকলে গাড়িতে উঠবার পর আমাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় নিলে সুবিধে হয় বলুন। আমি বললাম, পি জি হাসপাতালটাই কাছে। তখন একজন ড্রাইভারকে বলল, পি জি-তে নিয়ে চলুন দাদা!

ড্রাইভার গাঁইগুঁই কিছু করল না। সে কেবল বলল, পিঠ থেকে ছোরাটা সরিয়ে নিলে আমি গাড়ি একটু জোর চালাতে পারি—এখন তো সময় নষ্ট করার মত অবস্থা নেই আমাদের, কি বলেন? তখন পিঠ থেকে ছোরাটা সরিয়ে নিল—গাড়ি জোর ছুটতে লাগল। পি জি-র গেটের কাছে এসে গাড়িওলা বলল, দাদারা এবারে ঝটফট ভেতরে নিয়ে যান এঁকে। বলে গাড়ি থামিয়ে দিল।

আমি বললাম, না তা হবে না, গাড়িকে ভেতরে নিতে হবে। তখন দুর্বৃত্ত তিনজন বলল, না—না, ভেতরে নেবার আগে আমরা এখানে নেমে যাচ্ছি। এখন যাবার আগে কেবল একটা মাত্র অনুরোধ, পকেটে যার যা আছে দিয়ে দিন তো? বলে আমার পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করল, যাতে "আপনার চাকরী হল না" জাতীয় ভিজে ভিজে একগাদা কাগজ, কারেন্সি নোট মনে করে নিয়ে পকেটে পুরলো, আর ঐ ঝুপ ঝুপে বৃষ্টিতে আর অন্ধকারে কোথায় মিশে গেল। আসল নোটগুলো রয়ে গেল আমার ট্রাউজারের পকেটে! আর এই সুযোগে ড্রাইভারটি সুরেশকে রাস্তায় ফেলে রেখে গাড়ি চালিয়ে দ্রুত পালিয়ে

যাবার সময় একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে গুঁতো লাগিয়ে দিল, আর গাড়ি থেকে ড্রাইভারের আর্তনাদ শোনা গেল।

এরকম অবস্থায় জীবনে পড়িনি। এদিকে একটি সাপে কাটা রোগী, তার উপর বিষ্টির ঝমঝমানি, তারপর ঐ গাড়ির ড্রাইভার—সেও বোধহয় দারুণ আহত। এ অবস্থায় কি করি বুঝতে না পেরে একটু হতভম্ব হচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি সুরেশ উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি তখন তাকে বললাম, হ্যাঁরে সুরেশ, করিস কি, শুয়ে থাক। তোকে না সাপে কামড়েছে? সুরেশ তখন আমতা আমতা করে বলল, আমার মনে হচ্ছে সাপ টাপ নয়, ডেঁয়ো পিঁপড়ের কারবার। আমি বললাম, তাহলে চল ঐ ড্রাইভারকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিই—একটা ভাল কাজ করা যাক। সুরেশ তাতে রাজিও হয়ে গেল। আমরা তখন সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখি ড্রাইভারের মাথায় বেশ চোট লেগেছে, একটু একটু রক্ত পড়ছে তার মাথা দিয়ে। আর সে একটু যেন বেহুঁশ হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে সীটের উপর। আমরা যেতেই ড্রাইভারটি কেঁদে উঠল, বলল, বাবু—আমাকে পুলিসে দেবেন না। আমি তখন তম্বি করে বললাম, কেন দেব না—তুমি এইরকম বিশ্রী-ভাবে গাড়ি চালাও, তোমার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত। ড্রাইভার কাতরভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, সেটি পারবেন না আপনারা—কেন না, আমার লাইসেন্স নেই! তা ছাড়া, ড্রাইভার বলল.. তাছাড়া—এ গাড়িটি আমার নয়—আমি এটাকে চুরি করে পালাচ্ছিলাম।

এ কথায় হঠাৎ সুরেশ ড্রাইভারের পায়ের ধুলো নিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হাঁ করে দেখছিস কি? লোকটির উপর শ্রদ্ধা হয় না? নে নে পায়ের ধুলো নে এর। ঐ বিষ্টির মধ্যে কোথায় যেন বাজ পড়ল—চারিদিকে অন্ধকার আরো গাঢ় হল। রাস্তার ভিজে আলোর মধ্যে আমারও মনে হল ড্রাইভারের পায়ের ধুলো নেওয়া দরকার। যন্ত্রচালিতের মত আমি তার পায়ের ধুলো নিলাম।

পায়ের ধুলো নেওয়া হলে সুরেশ বলল, এবার এক কাজ করা যাক।

আমি বললাম, কি ?

সুরেশ বলল, তুই একদিকে কেটে পড়, আর আমি একদিকে কেটে পড়ি। বলে সে, কেন জানি না, রেস কোর্সের দিকে ছুটতে লাগল, আর আমি ওর কথা অমান্য না করে ছুটতে লাগলাম উলটো দিকে, সারকুলার রোড ধরে চৌরঙ্গী এবং পার্ক সার্কাস পেরিয়ে আরও অনেক উলটো দিকে।



নেতার হাটের পথে

লোকে ভোর চারটের সময় উঠে, তাড়াতাড়ি করে কোনো মতে খেয়ে নিয়ে, হঠাৎ পাওয়া তিনদিনের ছুটিতে গাড়িতে করে শ-খানেক মাইল গিয়ে ক্লান্ত হয়ে ডাক বাংলোয় আশ্রয় নিতে গিয়ে যদি দেখে সেখানে জায়গা নেই, তাহলে কি করে? বুদ্ধিমান লোক হলে সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটা দার্শনিকের মত করে ফেলে অন্য কোনো ডাক বাংলোর খোঁজ করে—তা সে ডাকবাংলো নেতারহাটের পালামু ডাক বাংলোর কাছাকাছি নাই বা হক। তিনদিনের ছুটি তো এমন আর পাওয়া যাবে না, অতএব মন খারাপ করে লাভ কি? অন্য ডাক বাংলোয় যাবার প্রস্তাবে প্রবীর কিন্তু ফোঁস করে উঠল। বলল, থাকতে হলে পালামু ডাকবাংলোই প্রশস্ত, সেজন্যই এত দূরে এলাম। অন্য বাংলোতে থাকতে হলে রাঁচীতেই তো থাকা যেত। অথবা কয়েক মাইল গিয়ে এক জলপ্রপাতের ধারে বসে পিকনিক করা যেত, কিংবা তাসও খেলা যেত।

আমি বললাম, কিন্তু উপায় কি? এই বাংলোয় জায়গা নেই, অতএব আমাদের ফিরতেই হবে। কৃশাণু একথায় তার মোটাসোটা শরীর নিয়ে হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, একটা অদ্ভুত বিলিতি গল্প মনে পড়ে গেল, শুনবে? একজন স্কচ, একজন ইহুদী আর একজন

ইংরেজ ...। কৃশাণুটা ঐ রকমই, আমরা সব মন খারাপ করে বসে আছি আর ওর কিনা হঠাৎ একটা বিলিতি গল্প মনে পড়ে গেল। প্রবীর বলল, তুমি একটু চুপ করো না কেন, বলে গাড়ি থেকে বন্দুকটা বার করে অকারণেই সেটা বাগিয়ে আকাশের দিকে তাক করতে লাগল। তারপর গাড়ি থেকে একটা সতরঞ্চ নামিয়ে এনে তার উপর শুয়ে পড়ে বলল, ডাক বাংলোয় রাত্তিরটা না হয় নাই কাটাতে পারলাম, যতক্ষণ পারা যায় এখানেই থাকি না কেন। বলে হাই তুলল। কৃশাণু বলল, চমৎকার আইডিয়া। বলে সেও সতরঞ্চের এক ধারে কাত হয়ে পড়ল, আর মনে হল সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘুমিয়েও পড়ল। কৃশাণু খুব তাড়াতাড়ি ঘুমুতে পারে—গাড়িতে বসে বসেই কতবার যে ঘুমিয়েছে তা গুণে রাখিনি, তবে বার সাতেক অন্তত সে ঘুমিয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি আর কি করি—নেতারহাটের ডাক বাংলো আর কাঞ্চন ফুলের গাছের অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমারও কেমন ক্লান্তি এসে গেল। সেখানেই তন্দ্রা এল।

কতক্ষণ ঐভাবে শুয়েছিলাম জানি না। বোধহয় আধ ঘণ্টাও হবে না, এমন সময় একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। এ গাড়ির আওয়াজ পাওয়ার কথা নয়—সুন্দর একটা ঝকঝকে নতুন আমেরিকান গাড়ি। তবে রাস্তায় পড়ে ছিল পাতা। শেষ ফাল্গুনের ঝরা পাতার রাশি। অনেক বনে এখন আগুন লাগায় কত পাতা পুড়ে যায়। রাত্রে পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বলে, দূর থেকে মনে হয় গলানো সোনা।

গাড়ির মালিককে একটু দেখবার চেষ্টা করলাম, চোখ দুটোকে অল্প একটু খুলে। দেখতে পেলাম না। নাম্বার প্লেট দেখে বুঝলাম বাংলা দেশের। গাড়ির লোকেরা বাঙালিও হতে পারে। তারপরই আবার চোখ দুটো বুঁজে এল। পরে শুনেছিলাম কৃশাণু এবং প্রবীরও ঠিক ঐভাবেই এক ঝলক গাড়িটাকে দেখে চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল।

চোখ বুঁজেই বুঝতে পারলাম গাড়িটা আমাদের কাছে এসে

থামল। তারপর গাড়ি থেকে আওয়াজ এল, বাঙালি নাকি? প্রচণ্ড বাজখাঁই আওয়াজে আমরা তিনজনেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম —প্রবীর ফস করে বন্দুকটাকে তুলে নিয়ে প্রায় কাঁধ বরাবর ওঠালো, কিন্তু পরক্ষণেই আওয়াজের মালিক বাঘ নয় এমনকি শেয়ালও নয় দেখে বন্দুকটাকে নামিয়ে ফেলে বলল, মনে হল একটু উত্তেজিত ভাবেই, বাঙালি, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা বাঙালি।

বাজখাঁই আওয়াজের মালিকের একটি বেশ ভাল জাতের টাক আছে। রোদ্দুরের আলোয় সেটা বেশ চকচক করে উঠল। তিনি বললেন, আপনারা কোথায় আছেন?

কৃশাণু বলল, কোথায় আবার থাকব, এই তো মাঠে রয়েছি।

গাড়িওলা বললেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি—কিন্তু রাত্তিরটা কোথায় কাটাবেন?

আমরা ভদ্রলোকের কথায় কেমন যেন চটে গেলাম। সাধারণত আমাদের তিনজনের মতের মিল কমই হয়। সর্বসময়েই আমরা তর্কের উপর তর্কই করছি। কিন্তু এই চটবার ব্যাপারে আমাদের ভিতরে বেশ দারুণ মিল দেখা দিল। প্রবীর বলল, আমরা কোথায় রাত্তির কাটাব তা আপনাকে বলতে যাব কেন? আমি বললাম, মশাই, আমরা ঘুমুচ্ছিলাম—এখানে এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে…আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই কৃশাণু বলল, বন্দুক দেখছেন না—আমরা একটু শিকারটিকার করবো। যদি নিরাপদে থাকতে চান তো চুপটি করে রাত্রে বিশ্রাম করবেন। বেড়াতে বেরুবেন না, গুলিটুলি গায়ে লেগে যেতে পারে।

তখনো কিন্তু আমাদের চোখে পড়েনি। গাড়িতে দেখি আরও দুজন রয়েছেন। তাঁরা দরজা খুলে নেমে এলেন। একজন বেশ লম্বা আর একজন মোটা এবং বেঁটে। মোটা এবং বেঁটে লোকটি বললেন, রাত্রে এদিকে প্যাঁচা শিকার করবেন নাকি?

প্রবীর বলল, কেন, এদিকে কি বাঘের অভাব নাকি?

বাঘ? লম্বা লোকটি আর বেঁটে লোকটি এক সঙ্গে হেসে উঠলেন।

মোটাটি বললেন, বাঘ এদিকে কোথায়? নাইনটিন ফরটি ফাইভে এদিকে শেষ বাঘ মারা পড়েছে। তারপর তাদের আর দেখা মেলেনি। এদিকে বুনো মোষও ছিল, কিন্তু নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে তারাও খতম হয়েছে। এখানে আমি নাইনটিন ফরটিন থেকে যাতায়াত করছি কিনা। তবে হ্যাঁ, পায়রা ঘুঘু কাক প্যাঁচা, দু-চারটে শেয়াল মারতে পারবেন হয়ত, যদি অবশ্য কপাল ভাল থাকে। শিকার এর আগে কখনো করেছেন বলে তো মনে হয় না, নইলে এই নেতারহাটে এসেছেন শিকার করতে?

তারপরই তার নজর পড়ল আমাদের গাড়ির দিকে। বললেন, ঐ গাড়ি চড়ে এতদূর এসেছেন, পাগল নাকি?

এবার আমার ভয়ানক রাগ হল। গাড়িটা পুরোনো বটে, মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে নাজেহালও হতে হয় আমাদের কম নয়। কিন্তু ঐ গাড়িতে চড়ে ভারতবর্ষের কত জায়গা যে ঘুরেছি তার ইয়ত্তা নেই। বছরে হাজার পাঁচেক মাইল তো রাঁচীর বাইরেই ঘুরেছি।

আমি বললাম, মশাই আমরা পাগল নই। আর সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি হয়ে আমাদের অমন উপদেশ দিতে আসাটা মোটেই ভদ্রতাসূচক নয়। আমাদের গাড়ির চাইতে আপনার গাড়ি নতুন এবং ঝকঝকে হতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাদের গাড়ি খারাপ।

এবার টাকওলা ভদ্রলোক বললেন, না না, খারাপ তো বলা হয়নি। এইসব পাহাড়ী পথের পক্ষে ঐ মান্ধাতা আমলের গাড়ি একটু বিপজ্জনক। একথা বলাটা আমার কর্তব্য বলেই বললাম।

আমরা গুম হয়ে বসে রইলাম। তখন লোকগুলি গাড়িতে উঠে নিজেদের মধ্যে খুব হাসাহাসি করতে করতে ডাকবাংলোর দিকে এগিয়ে চললেন। আমরা সেদিকে তাকিয়ে বিষাদগ্রস্ত হলাম। আস্তে আস্তে বিকেল হতে লাগল।

অবশেষে যখন সন্ধে প্রায় হয় হয়, তখন আমরা গাড়িতে গিয়ে বসলাম। সঙ্গে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রয়েছে, টিনের সব খাবার রাঁচী থেকে

আনা। অতএব সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত। সেগুলো সব নিয়ে আবার রাঁচীতে ফিরে যাবার কোন মানে হয় না। এখনো দুদিন পুরো ছুটি পড়ে রয়েছে। এখন তাড়াতাড়ি যদি ফরেস্ট ডাকবাংলো বা ইনস্পেকশন বাংলোয় যাওয়া যায়, তবে মোটামুটি খারাপ কিছু হয় না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমরা। কিন্তু গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বুঝলাম, আমাদের আর কোনো ডাকবাংলোতেই যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কৃশাণু খুব ভাল মেকানিক। সে তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ির বনেট খুলে কি সব দেখে টেখে বলল, গাড়ির তারগুলি সব পুড়ে গলে গেছে। শর্ট সারকিট।

অবশ্য আমাদের কাছে প্রচুর তার ছিল। যন্ত্রপাতিরও বাক্স ছিল, আর ছিল টর্চ। অতএব আমরা তিনজন মিলে ঘণ্টা দুয়েক পরিশ্রম করে গাড়িটাকে মেরামত করে ফেললাম। আমাদের এই মেরামত করা বোধহয় নতুন গাড়ির লোকেরাও দেখেছিল—জায়গাটা ডাক বাংলো থেকে এমন কিছু দূরে নয়। তাছাড়া আমরা বেশ জরে জোরেই কথাবার্তা বলছিলাম। দু-একজন লোকও আমাদের কাছ দিয়ে হেঁটে গেছে, তারাও দেখেছে।

মেরামত হবার পর গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাব, এমন সময় দেখি, ঠিক আমাদের পিছনে টাকমাথা লোকটি দাঁড়িয়ে বলছে, মেরামত হল? কি, হয়েছিল কি?

প্রবীর বলল, কি আর হবে—কিছু হয়নি। আমরা গাড়িটা খুলে মেকানিজম দেখছিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, ঐ গাড়ি বাড়িতে ফিরে বেচে দিন, যদি আমার পরামর্শ শোনেন। পুরোনো গাড়ির মহা ঝামেলা।

আমরা ভদ্রলোকের ব্যবহারে খুব চটে গেলাম আবার। তারপর কোনো কথা না বলে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। বললাম, ইনস্পেকশন বাংলো, না ফরেস্ট বাংলো?

প্রবীর বললো, কোথাও না। নেতারহাট জায়গাটাই খারাপ

লাগছে—ঐ বদমায়েশ লোকগুলির জন্য। কোথায় গাড়ি খারাপ হলে এসে সাহায্য করবে তা নয়, কেবল বকর বকর বকর। রাঁচীতেই ফিরে চলো। রাত দুটো তিনটে হয়ত হয়ে যাবে, কিন্তু এখানে আর থাকতে এক মিনিটও ইচ্ছে করে না।

আমার আবার নেতারহাটের সূর্যোদয় দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল বহুদিন আগে থেকে। কখনও দেখিনি। তাই মনে মনেই একটু খুঁত খুঁত করলাম। ফিরে আসার সময় বেশ কষ্টই হতে লাগল।

মাইল পঞ্চাশেক এসেছি নির্বিঘ্নে। রাত তখন একটার কাছাকাছি। রাত্তিরটা বেশ বিদঘুটে রকম অন্ধকার। আর গাড়ির হেড লাইটটা খারাপ হওয়াতে আস্তে চালাতে গিয়ে এত দেরি হল। একটা ছোট জলাশয় দেখতে পেয়ে গাড়িটা থামালাম। বললাম জায়গাটা বড় ভাল। এখানে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। আমরা নেমে পড়ে কিছু শুকনো কাঠ যোগাড় করে পাতাতে আগুন জ্বালিয়ে কাঠগুলো তার উপর দিয়ে দিলাম, সসপ্যানে জল দিয়ে তার ভিতরে খাবারের টিনগুলি ফেলে ফোটাতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎ কি রকম অদ্ভুত গোলমাল শুনতে পেলাম। বহুদূরের থেকে আওয়াজ আসছে—কারা যেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, হাতে মশাল।

প্রবীর বললো, ডাকাত নাকি? তাড়াতাড়ি আমি বন্দুক দুটি গুলি ভরে নিলাম, আর কতকগুলি গুলি পকেটে রাখলাম। কৃশাণু বলল, এদিকে মাঝে মাঝে ডাকাতি হয় বটে। কয়েক মাস আগেই একটা গাড়িকে আটকিয়ে হাজার তিনেক টাকা লুট করে একদল ডাকাত। তারও তিন মাস আগে এরই কাছাকাছি......

আমি বললাম চুপ। আর কোনো কথা নয়। এবারে কোথাও লুকিয়ে থাকা যাক। প্রবীর বলল, লুকুলেও গাড়িটাকে তো লুকনো যাবে না। অতএব বন্দুক নিয়ে ঝোপের মধ্যে বসে থাকি। এইসব ডাকাতদের হাতে বন্দুক নাও থাকতে পারে। আর তা যদি হয়,

তাহলে হয়তো আমরা ডাকাতদের ধরে একটা নামও করে ফেলতে পারব।

কিন্তু ডাকাত ধরে আর নাম করা হল না। কেননা, দেখা গেল ওরা ডাকাতই নয়। ওরা কোত্থেকে একটা মাঝারি গোছের সম্বর মেরেছে, এখন আনন্দে বাড়ি ফিরছে। ঐ দেখে হঠাৎ প্রবীরের মনে যে আইডিয়াটি এল, সেটি যেমন অদ্ভুত তেমনি অপ্রত্যাশিত। প্রবীর বলল, সম্বরটাকে কিনে ব্যাটাদের দেখালে কেমন হয়?

আমরা তক্ষুনি বুঝলাম, এই 'ব্যাটারা' কারা। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, দেখ যদি কিনতে পার। এতগুলো লোক কি আর তাদের শিকারকে ছেড়ে দেবে?

যা ভেবেছিলাম তাই। তারা কিছুতেই দেবে না, প্রবীরেরও জেদ চেপে গেল। কুড়ি টাকা থেকে দর শুরু করেছিল, এখন দেড়শো টাকা দর উঠিয়েছে সে, তবু লোকেরা তাদের সম্বরকে দেবে না। অবশেষে প্রবীর বলল, বেশ সম্বরটাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য তারা যদি ধার দেয়, তাহলেও হবে। সকাল নটার মধ্যে সে সম্বরকে ফেরৎ দিয়ে যাবে। দুশো টাকা জমা দিয়ে।

সম্বরটাকে গাড়ির উপরে ওঠানো হল। বেশ পরিপাটি করে বাঁধা হল। তারপর আমরা গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। আবার চললাম নেতারহাটের দিকে। মনে অদ্ভুত এক রকমের উন্মাদনা জন্মালো। বুঝতে পারছিলাম, এর কোনো অর্থ হয় না। যে লোক অভব্যতা করেছে, যারা আমাদের অবস্থাকে ইয়ার্কি করেছে, আমাদের গাড়িকে তাচ্ছিল্য করেছে, তারা মানুষই নয়। যারা বলেছে, এদিকে প্যাঁচা আর দু-একটা শিয়াল আর পাখি ছাড়া অন্য কোন রকম শিকার পাওয়া যায় না, তাদের কাছে সম্বর নিয়ে গিয়ে দেখানোর কোন সার্থকতা নেই। তাতে আমাদের কোন উপকার হবে না। কিন্তু কথাটা এখন বুঝি: ঠিক সেই সময়ে তা মনে হয়নি। তা নইলে আবার না ঘুমিয়ে অতটা পথ যাবার প্রস্তাবে রাজী হই?

কেবল মনে হচ্ছিল, এইবারে একটু প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। বলা যাবে, এই সম্বরকে আমরা শিকার করেছি।

ফিরে গিয়ে ভালোই হয়েছিল। এত ভাল হবে তা আমরা অবশ্য ভাবিনি। নেতারহাট থেকে মাইল দশেক দূরেই তাঁদের দেখা পেলাম। সুন্দর ঝকঝকে নতুন গাড়িটি রাস্তার এক ধারে গড়িয়ে পড়ে আছে কাত হয়ে। গাড়িটির কাঁচ একটিও আস্ত নেই; একেবারে বেঁকেচুরে এমন হয়েছে যে, চেনবারও জো নেই। তিনজন লোক কিছু দূরে নানা ভঙ্গিতে শুয়ে ছটফট করছে আর চিৎকার করছে। কাছেই গাড়ি থামিয়ে দিলাম। গলা বাড়িয়ে কৃশাণু জিজ্ঞেস করল, দাদারা কোথায় আছেন ?

কাতরে উঠলেন টেকো ভদ্রলোকটি। বললেন, আর বলেন কেন মশাই, স্কিড করে গাড়িখানা অ্যাকসিডেন্ট করেছে। এখন এইখানেই রয়েছি। প্রবীর বেশ হাসি হাসি মুখ করে বলল, তা রাত্তিরটা কাটাবেন কোথায় ?

একথা শুনে অন্য দুজন লোক উঃ আঃ করে উঠলেন।

আঘাত খুব মারাত্মক হয়নি কারুর। তবে তিনজনেরই অল্পবিস্তর যে লেগেছে, এবং তাঁরা তিনজনেই যে সহজে সভ্য জগতে ফিরতে পারবেন না গাড়ি সমেত, সেটা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হল না।

টেকো লোকটির নজর পড়ল এবার আমাদের গাড়ির ওপরটায়। —সম্বর দেখছি যে!—বললেন তিনি। প্রবীর একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, রাস্তার ধারে মচমচ আওয়াজ শুনেই গুলি করলাম, আর পেয়ে গেলাম।

বেঁটে লোকটি বলল, সম্বর—সম্বর পেয়ে গেলেন ?

প্রবীর বলল, তবে আর বলছি কি। তাছাড়া বিকেলের দিকে গেলে বাঘও পেয়ে যেতে পারতাম। একটা নরখাদক বাঘ—দিন নেই রাত নেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা আপনারা রাত্তিরটা কোথায় থাকবেন ?

একথা শুনে লম্বা লোকটি বলল, অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে, দাদারা আমাদের একটা উপকার করবেন?

এবারে আমি বললাম, কি করতে হবে?

লম্বা লোকটি বলল, যদি দয়া করে আমাদের নিয়ে যেতেন নেতারহাটে। সেখানে গিয়ে একটু সুস্থ হয়ে আসা যাবে।

আমি বললাম, পাগল হয়েছেন, আমাদের এই মান্ধাতার আমলের গাড়িতে আপনারা চড়বেন? আপনাদের নতুন গাড়িতে চড়া অভ্যাস। ভীষণ খারাপ লাগবে যে!

এবারে লোকটি বললেন, মশাইরা—আপনাদের হাতে পায়ে ধরছি। আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে—আপনাদের গাড়িটার মত গাড়ি হয় না।

আর ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল—আমাদের গাড়িটা একা একাই পিছনের দিকে দৌড়চ্ছে। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর ক্রমশ জোরে, সধরটিকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাহাড় গড়িয়ে একেবারে পঞ্চাশ ফুট। তারপরে এমন একটা আওয়াজ হল যে, সমস্ত পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি উঠল। অথচ গাড়িটা এমন ব্যবহার কেন করল, তা বুঝতে ঠিক পারলাম না। এমন বিশ্বাসঘাতকতা তো মানুষেও করে না।

আমি প্রবীর আর কৃশাণু সেই দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলাম। বেশ খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকবার পর টেকোটার গলা শোনা গেল: এবার আমরা কি করি? কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা ছজনে মিলে এক সঙ্গে পরামর্শ করতে শুরু করলাম, কি করে রাঁচী ফিরে আসা যায়, গাড়িগুলিকে কিভাবে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া যায় ইত্যাদি। এতক্ষণ আমরা দুটি দল ছিলাম, হঠাৎ আমরা ঐক্যবদ্ধ হলাম।

লোকগুলিকে আগে যতখানি খারাপ মনে হয়েছিল, এখন কিন্তু তা মনে হচ্ছিল না। আমি প্রবীর এবং কৃশাণু এক সঙ্গে বলে উঠলাম, সত্যিই তো, এখন কিছু একটা করতে হয়।



চক্কোত্তি মাস্টার

মনতারা—মনতারা—মনতারা—

দেবদারু গাছের তলায় শুকনো পাতার জঙ্গলে লোকটা মরেই যাচ্ছিল—আর বলছিল—মনতারা—মনতারা—মনতারা। সব সময় নয়, কখনো কখনো।

সকালে কেউ দেখতে পায়নি, বা শুনতেও পায়নি। বেলা দশটা নাগাদ চক্কোত্তি মাস্টার হন হন করে ইস্কুলে যাবার পথে হঠাৎ আওয়াজটা শুনতে পান। দেবদারু গাছের আড়াল থেকে আওয়াজ আসছিল। একটু একটু গোঙানির ভাব—কিন্তু আওয়াজ তীক্ষ্ণ। মনতারা - মনতারা—মনতারা।

—যতো সব! বলে চলেই যাচ্ছিলেন। কি মনে করে ফিরে এলেন। কাছাকাছি লোক কেউ নেই। মনে একটু ভয়ও হল। রাত্রে চক্কোত্তি মাস্টার নানা রকম ভূত-টুতের ভয় পান, দিনের বেলাতেও সে ভয়টা কখনো কখনো তাঁকে পেয়ে বসে। একটু সময় পেলে হয়ত ঐ আওয়াজটাকে তিনি ভূতেরই আওয়াজ ভেবে পালিয়ে যেতেন, আর লোকটাও মরে যেত। কিন্তু তা হল না।

তিনি একপা একপা করে চললেন জঙ্গলের দিকে। দেখলেন পাতায় ঢাকা একটা লোক—খুব রোগা নয়—কালোও নয়, খোঁচা

খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখ। চোখ বন্ধ। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ তার হাতে-পায়ে টান ধরছে, আর বলে উঠছে, মনতারা—মনতারা—মনতারা···।

ঠাণ্ডা। পৌষ মাসের সকাল—এখনো জঙ্গলে রোদ্দুর ঢোকেনি। সবে কুয়াশা সরে যেতে শুরু করেছে। চক্কোত্তি মাস্টার সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন কিছুক্ষণের জন্য। হঠাৎ তার বুকে ব্যথা বোধ হল।

চক্কোত্তি মাস্টার একটু কাছে গেলেন লোকটির। পাতা সরালেন গায়ের উপর থেকে। জায়গাটা একটা গর্তের মত ছিল। সেই গর্তের মধ্যে লোকটার সমস্ত শরীরটা, আর শুকনো পাতা দিয়ে ঢাকা।

পাতা সরাতেই চোখে পড়ল পকেটে ফাউনটেন পেন, আর ফুলে ওঠা বুক পকেটে একটা খাম। চক্কোত্তি মাস্টার আস্তে করে খামটা বার করলেন। সেটাকে খুলে দেখলেন, তার মধ্যে একশো টাকার তিনটে নোট, আর দশ টাকার বেশ কিছু নোট। সব সমেত শ' ছয়েকেরও বেশি টাকা। লোকটি বোধহয় একবার তাকিয়ে দেখল—ই-ই করে কি বলতে গিয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেল।

খামের উপর লেখা আছে কৃপানাথ সমাদ্দার। কি মনে হল, চক্কোত্তি মাস্টার লোকটির কপালে হাত রাখলেন। গরম—প্রচণ্ড গরম কপাল। লোকটার কোনরকম হুঁশ নেই। হঠাৎ ভাবলেন, এবারে যাই পালিয়ে—তাহলে এতগুলি টাকা হাতে এসে যাবে। ভগবান এ টাকা পাঠিয়েছেন। কাল রাত্রেই তিনি ভাবছিলেন কিছু টাকা দরকার—বাড়িটা একটু সারাতে হবে আর এক জোড়া ভাল জুতো কিনতেও হবে। ছেলে পুলেদেরও জামা কাপড় কতদিন কেনা হয়নি। এবার পুজোর সময় নিজের অসুখেই খরচ হয়ে গেল কত। কোলকাতায় যেতে হয়েছিল বড় ডাক্তার দেখাতে। বুকের ব্যথাটা যায়নি—এখনো তা চাড়া দিয়ে ওঠে।

চলেই আসছিলেন খামখানা নিয়ে। কিন্তু সেই সময়ই লোকটা হঠাৎ যেন চমকে উঠে পাশ ফিরল। অস্ফুটভাবে বলল- কমলা!

কমলা! আমি আসব না। হা-হা-হা—আমি আসব না। গেলাম। জল-জল-জল—উঃ

চক্কোত্তি মশাই রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। এদিক-ওদিক কেউ নেই। কাউকেই দেখা যায় না। ইস্কুলের ঘণ্টা দূর থেকে শোনা গেল। দূর ছাই! তিনি ধীরে ধীরে পা বাড়ালেন।

দশ মিনিট পর তিনি ক্লাসে গিয়ে বসলেন। তাঁর এক হাত পকেটে, শক্ত করে খামটিকে ধরে আছেন। তাড়াতাড়ি চলাতে তিনি হাঁপাচ্ছেন। বুক ঢিপ ঢিপ করছে।

লোকটা কে? কৃপানাথ সমাদ্দার—নামটা একেবারে চেনা নয়। লোকটা এখন কি করছে? কত তার বয়স হবে? ত্রিশ-বত্রিশ চল্লিশ? কি করে সে। সে এখানে মরতে এসেছে কেন?

ছাত্রদের তিনি অঙ্ক দিলেন। একজন লোকের ছশো টাকা ছিল। সে তা থেকে পাঁচ জোড়া জুতো কিনল—এক এব জোড়ার দাম পনের টাকা, পাঁচ জোড়া মোজা—এক এক জোড়ার দাম তিন টাকা—বাড়ি সারানোয় খরচ করলো দুশো চল্লিশ টাকা—ধার শোধ করল একশো ত্রিশ টাকা, কত বাকি থাকল?

আচ্ছা, কৃপানাথ সমাদ্দার তখন কি করছে? মরে গেছে? বোধহয় মরে গেছে। লোকটি জল চাচ্ছিল—সেটা না দেওয়া ভাল হয়নি। এখন অবশ্য দেওয়া যেতে পারে। ছেলেদের অঙ্ক কষতে দিয়ে তিনি হেডমাস্টার মশাইএর ঘরে গেলেন। বললেন, দত্তদের দেবদারু বনে একটা লোক জল জল করে চেঁচাচ্ছিল—মনে হয় অসুস্থ, একটু দেখে আসবেন নাকি?

দু' মিনিটের মধ্যেই সোরগোল পড়ে গেল। পাঁচজন মাস্টার মশাই একটা কুঁজো আর একটা গেলাস হাতে করে চললেন দত্তদের দেবদারু বনের দিকে।

না, লোকটা নিশ্চল হয়ে থাকলেও বেঁচে আছে। ডাক্তারবাবুর কাছে তখনি খবর গেল। ডাক্তারবাবু তাঁর বাক্স আর স্টেথোস্কোপ নিয়ে বেরুলেন। স্টেথোস্কোপ তাঁর গলায় ঝুলতে লাগল।

বাক্সে অনেকখানি জায়গা থাকা সত্ত্বেও—বাক্সে জায়গাই আছে আর দু চারটে ট্যাবলেট রয়েছে এখানে ওখানে গোঁজা—একটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, একটু অ্যায়োডিন, এক বাণ্ডিল তুলো। এর মধ্যে একটা কেন, পাঁচটা স্টেথোস্কোপ রাখা যায়—কিন্তু তিনি কখনো রাখেন না।

—ফী' এর আর ওষুধের দাম দেবে কে? বললেন তিনি শার্ট পরতে পরতে। চক্কোত্তি মাস্টারই তাঁকে ডাকতে গিয়েছিলেন। বললেন, আমি দেব—আপনি চলুন। মনে মনে ভাবলেন, লোকটা সেরে না উঠলেই বাঁচি।

বাঁ হাতে তিনি পকেটে সেই খামটাকে চেপে ধরলেন। শীতকালেও হাতটা যেন ঘেমে গেছে—তাতে যেন খামটা ফসকে ফসকে যাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু চক্কোত্তি মাস্টারের কথায় একটু অবাকই হলেন। তাঁর ভিজিট যদিও মাত্র এক টাকা—কালে ভদ্রে সেটা তিনি লোকের কাছ থেকে পান। এক কথায় চক্কোত্তি মাস্টার একেবারে ফী দিতে রাজি হওয়ায় তিনি একটু অবাকই হলেন। হাঁ করে কয়েক সেকেণ্ড তাঁর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, লোকটার কি জাত জানেন? আর একটা কথা—কেবল ফীতে তো হবে না, ওষুধপত্র দিতে হতে পারে। তেমন জ্বর হলে ইনজেকশন দিতে হতে পারে, তাতেও কম করে চার ছ টাকা খরচ আছে।

চক্কোত্তি মাস্টার বললেন, লোকটা রোগী এইটুকুই জানি—কি জাত তা জানার দরকার কি। তাছাড়া অসুখ হয়ে একটা লোক মরে যাচ্ছে এখন ওষুধের দাম নিয়ে কথা না বললেই ভাল। কেউ না কেউ দিয়ে দেবেই দেখবেন।

ডাক্তারবাবু হেসে উঠলেন। চশমা মুছতে মুছতে বললেন, কেউ না কেউ দেবে না ছাই।—কেউ দেয় না—লোকদের আমার চিনতে বাকি নেই। ঐ তো বীরেশ মিত্তিরের ছেলের জ্বর বমি হল, মরে মরে—তা আমি একমাস ধরে গেলাম না তার বাড়ি, দিলাম না ওষুধ? হিসেব করলে তা ষাট টাকার কম

হবে না পাওনা। কত দিল শেষ পর্যন্ত? এগারো টাকা। তাগাদা দিতে দিতে অস্থির হয়ে এখন ছেড়ে দিয়েছি। তবে পাব ঠিকই শেষ পর্যন্ত, না দিয়ে কোথায় যাবে? এর পর একটা অসুখ হক ও বাড়িতে তখন সুড় সুড় করে টাকা বেরুবে। গরীবদের কথা বুঝি—যারা সত্যি দিতে পারে না। তারা মরেও যায় তেমনি। হাসপাতালও তো এখানে নয়—সেই সাত মাইল দূরে। কে যায় সেখানে—গোরুর গাড়ির ভাড়াই তো দশ টাকার কম এক পয়সা নয়।

চক্কোত্তি মাস্টার বললেন, তা ফী বলেন, ওষুধ বলেন, যা খরচ হয় আমাকে বলবেন দিয়ে দেব ঠিকই। বিনা চিকিৎসায় তো একটা লোককে মরতে দেওয়া যায় না!

বলতে বলতে ভাবলেন, লোকটা এখন যদি বুদ্ধি করে মরে গিয়ে থাকে তো ভাল হয়।

ডাক্তারবাবু যখন দেখলেন তখন যদি না দেখতেন তাহলে লোকটি আর বেশীক্ষণ বাঁচত না। তিনি গিয়েই কি একটা ওষুধ জোর করে গলায় ঢেলে দিলেন। তারপর কয়েকজনে মিলে তাকে ধরাধরি করে প্রথমে রাস্তায় শোয়ালেন। একটু দূরেই কালীমন্দির। একজন বলল, ঐ কালীমন্দিরের দাওয়ায় নিয়ে যাওয়া যাক।

কাছাকাছি আর কিছু ছিল না, তাই ঐ কালী মন্দিরেই নিয়ে যাওয়া হল।

তারপর ডাক্তারবাবুর কথা মত ছেঁড়া কাঁথা, বালিশ, মাদুর এল। লোকটাকে ভদ্রলোকের মতই দেখতে। দেখবার লোকেরও অভাব হল না। ইস্কুলে খবর পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ছুটি হয়ে গেল। প্রচুর ছাত্র এসে গেল দেখতে। একজন লোক মাথায় জল ঢেলে দিল। একজন হাওয়া করতে লাগল। লোকটা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে রইল।

ডাক্তারবাবু যাবার সময় চক্কোত্তি মাস্টারকে ডাকলেন। এবারে আমাকে বিদায় করার ব্যবস্থা করুন মশাই। এখন চলে যাচ্ছি, ওষুধ দিয়ে গেলাম, নাড়ির গতিক তেমন ভাল নয়। বাড়াবাড়ি দেখলে খবর দেবেন।

খামটা ভিজে একেবারে ছিঁড়ে গেছে। চক্কোত্তি মাস্টার বললেন, কত টাকার ব্যাপার হল ডাক্তারবাবু ? ডাক্তারবাবু বললেন, তা ছ টাকা তো হলই। আজ যদি টিকে যায় তাহলে শহর থেকে আরো দু তিনটে ওষুধ আনাতে হবে। তাও দশ বারো টাকা লাগবে তখন। আপাতত ছটি টাকা দরকার।

চক্কোত্তি মাস্টার বললেন, ভাঙানি তো নেই যে দেব। আপনি বাড়ি যান, আমি পরে গিয়ে দিয়ে আসব ঠিক।

ডাক্তারবাবু অবশ্য ব্যাপারটায় তেমন উৎসাহ পেলেন না। বললেন, তা খুচরো যা হয় আমি দিয়ে দেব—আমার পকেটেও কিছু আছে তো। আসলে তাঁর পকেটে ছিল একটা আধুলি—সকালে একজন পেটের অসুখের জন্য দেখাতে এসেছিল, তারই ফীটা। আর কিছু ছিল না।

চক্কোত্তি মাস্টার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছেঁড়া খাম থেকে একটা নোট বার করলেন। সেটা একটা দশ টাকার নোট হবে মনে করে দিতে যাবেন, হঠাৎ বললেন, ঐ যা ভুল হয়ে গেছে। দাঁড়ান ঠিক নোটটা বার করি।

দশ টাকার নোট একখানা এবারে বার করে তিনি ডাক্তারবাবুকে দিতে গেলেন।

ডাক্তারবাবু এই ঘটনায়—একেবারে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলেন। এরকম অভিজ্ঞতা—তা তিনি এই গ্রামে আটত্রিশ বছর রয়েছেন—এই প্রথম। কোনক্রমে সামলে নিলেন। একটু আমতা আমতা করে বললেন, ঐ যাঃ, পাকটে তো খুচরো নেই। তা আপনিই না হয় পাঠিয়ে দেবেন ঠিক সময়ে, অ্যাঁ মাস্টার মশাই ?

মনে মনে বললেন, আজকাল মাস্টাররাও পর্যন্ত ঝটপট টাকা বার

করে ফেলে, কেবল ডাক্তাররাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। দেশের যে কি হাল হল!

বিকেলের দিকে অসুস্থ লোকটিকে চক্কোত্তি মাস্টার নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। তাঁরই ঘরের এক কোণে একটা জায়গা করলেন। সেখানে খড় বিছিয়ে দিলেন আর তার উপর একটা ছেঁড়া মাদুর—যেটা মন্দিরে লোকটিকে পেতে দেওয়া হয়েছিল—বিছিয়ে দিলেন। বালিশটাও সেই মন্দির থেকেই কে নিয়ে এসেছিল।

তারপরই—এতক্ষণ ভীড়ে এক পা চলা যাচ্ছিল না, গ্রাম ভেঙে সব লোক এসেছিল দেখতে—সব ফাঁকা হয়ে গেল। চক্কোত্তি মাস্টার দেখলেন এখন বাড়িতে তিনি, গৃহিণী, তাঁর চার ছেলেমেয়ে আর গোয়ালে গোরুটি ছাড়া আর কেউ নেই।

লোকটি এতক্ষণ অজ্ঞান নিঃসাড় হয়ে ছিল। হঠাৎ সে পাশ ফিরে শুয়ে আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে উঠল!

চক্কোত্তি মাস্টার তার কাছে গিয়ে বসলেন। বড্ড মশা হয়েছে। সন্ধ্যেবেলা হলেই তারা পাগলের মত কোত্থেকে জুটে যায়। বোধহয় ততক্ষণ লোকটাকে কামড়াচ্ছিল। একটা পাখা নিয়ে তাকে হাওয়া করতে লাগলেন।

হঠাৎ লোকটা অস্পষ্ট ভাবে বলল, কমলা—কমলা। চক্কোত্তি মাস্টার বললেন, তা এখানে কমলা কোথায় পাব। কাল শহর থেকে এনে দেব। এখন জল খান। মাস্টার-গৃহিণী বারান্দায় বসে তরকারী কুটছিলেন। তিনি এসব বাজে ঝামেলা বাড়িতে নিয়ে আসায় প্রথম থেকেই বিগড়ে ছিলেন। একথায় একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, খুব তো লাটসায়েবি হচ্ছে। নিজে খেতে পায় না, যত সব ঝামেলা ঘাড়ে নেওয়া। কোত্থেকে তুমি পয়সা পাবে শুনি ঐ কমলার, অ্যাঁ? একটা কড়াই কেনা হচ্ছে না তিন মাস বলে বলে—কি করে তুমি ডাক্তারকে ছ' ছ'টা টাকা দিলে? আর কোথায় টাকা রেখেছিলে আমাকে না জানিয়ে, অ্যাঁ?

—চুপ করো তুমি, চুপ! গর্জন করে উঠলেন চক্কোত্তি মাস্টার। দুর্দশার একটু সাহায্য করা ব্রাহ্মণের কাজ, বুঝলে?

এরপর গৃহিণী প্রায় দশ মিনিট ধরে যা বলে গেলেন তার ঠিক বর্ণনা সংক্ষেপে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তাতে লঙ্কার ঝাঁঝ আর ঢাকের নিনাদ দুই-ই প্রচুর পরিমাণে ছিল। বলা বাহুল্য, এই দুইটিতেই চক্কোত্তি মাস্টার বহুদিন ধরে অভ্যস্ত এবং গৃহিণীর পক্ষে এই ব্যবহারই স্বাভাবিক। চক্কোত্তি মাস্টার এর জবাবে একটি কথাও বললেন না।

খানিক পর, কোন উত্তর না পেয়ে গৃহিণী থালায় কুটনো নিয়ে চললেন রান্নাঘরের দিকে। এই সময় গোরুটা হাম্বা করে ডেকে উঠল। বললেন, ঐ যাঃ ওকে তো জল দেওয়া হয় নি। বলে কুটনো বারান্দাতেই রেখে হন হন করে কুয়োর দিকে চললেন।

ঠিক এই সময় শোনা গেল ডাক্তারবাবুর গলার আওয়াজ। চক্কোত্তি বাড়ি আছেন নাকি? রোগী কেমন আছে?

চক্কোত্তি মাস্টার অবাকই হয়ে গেলেন। না ডাকতেই ডাক্তারবাবুর আগমন হওয়ায় তিনি মনে মনে ভাবলেন—আমি আর বুঝি না! আমার একশো টাকার নোট দেখে ফেলেছে, এখন ঘন ঘন তো আসবেই। চিনতে বাকি নেই কারু। এমনি বললেন, আসুন ডাক্তারবাবু আসুন। লোকটার জ্ঞান এখনো হয়নি। কমলা খেতে চাচ্ছে অজ্ঞান অবস্থাতেই।

—কমলা? ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ কমলা। স্পষ্ট শুনলাম। চক্কোত্তি মাস্টার বললেন।

দুজনে গিয়ে রোগীর কাছে বসলেন। গৃহিণী একগাল হেসে ডাক্তারবাবুকে বললেন, চা করে দিই? এই গৃহিণী যে কয়েক মুহূর্ত আগে অন্য মূর্তি ধারণ করেছিলেন, কে বলবে।

ডাক্তারবাবু রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন—বিশেষ সুবিধের দেখছি না। গায়ের তাপও কমের দিকে যায়নি। নিউমনিয়া

হয়েছে বলে মনে হয়। ভাল ওষুধপত্র দরকার। পেটেও কিছু পড়ার দরকার।

লোকটি এবার আঁ আঁ করে উঠল। একটু উঠে বসবার চেষ্টা করল। অস্পষ্ট গোঙানি মিশিয়ে বলল, জল। কমলা, জল দাও।

তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবু পাশে রাখা কাঁসার ভারি গেলাস থেকে একটু জল তার মুখে ঢেলে দিলেন। লোকটি বলল, তুমি আমাকে চিনতে পারছ, কমলা? অ্যাঃ চিনতে পারছ?...অ্যাঃ, কমলা? কমলা আমি চলে যাওয়াতে তোমার কিছুই মনে হয়নি?...

তারপর আবার নিঃসাড়। এ কথাগুলোও যত স্পষ্টভাবে লেখা হল, তত স্পষ্টভাবে সে বলেনি। আস্তে আস্তে জড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে বলল। বলেই চলল।

ডাক্তারবাবু বললেন, একটু বার্লি করে দেবেন ওকে। আমি এখন চলি—খারাপ দেখলে ডাকবেন—এখন বিকার চলছে। আরো কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে। ওর কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবেন। সম্ভব হলে নাম ঠিকানা জেনে নেবেন—বাড়ির লোকদের খবর দেওয়া দরকার।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। গিন্নী এতক্ষণ বারান্দাতেই ছিলেন। বললেন, এ কমলাটি লেবু নয়, মেয়ে। বোধহয় ওর বৌ-টৌ কেউ। লোকটি বোধহয় বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এসেছে। তাই মনে হচ্ছে।

তারপর কাছে এসে বললো, কি জাতের লোক, অ্যাঁ? চেহারাটা ভালই। এরকম অসুখ হল কেন?

রাত্তির ন'টার ভেতরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বার্লি করে এনে লোকটিকে খাওয়ানোর চেষ্টা করেও আর কিছু খাওয়ানো গেল না।

সারাদিন চক্কোত্তি মাস্টার সময় পাননি খামটা খুলে দেখার। টাকা ছশোই তো আছে, না কম। কিংবা বেশীও তো হতে পারে।

তিনি খামটাকে নিয়ে একেবারে চলে গেলেন বাড়ির বাইরে। সেখানে চাঁদের আলোয় গুণে গুণে দেখলেন, সব সমেত ছশো পঞ্চাশ টাকা। এ ছাড়া লোকটির পকেটেও কিছু আছে এখনো। কিছু নোট আর খুচরো। খামটিকে তিনি সযত্নে হাতে নিয়ে শোয়ার ঘরে তোশকের তলায়, অনেক দূরে—যতদূর হাত যায় —রেখে দিলেন। ডাক্তারবাবুকে এখনো দেওয়া হয়নি। কাল দিলেই হবে।

ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে পাশের ঘরে। গভীর রাতের আওয়াজ শুরু হয়েছে। প্যাঁচার ডাক, শেয়ালের ডাক আর ঝোপজঙ্গল ভেঙে কোন জন্তুর দৌড়নোর আওয়াজ। দূরে কুকুরের ডাক—ঝিঁঝিঁ। লোকটির নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বুকের মধ্যে শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। চক্কোত্তি মাস্টার এতক্ষণ পর এই গড়গড়াটাকে ধরিয়ে ফুরুৎ ফুরুৎ করে তামাক টানতে লাগলেন। সুন্দর তামাকের গন্ধে ঘর ভরে গেল। চেয়ারে বসে রইলেন তিনি। মাঝে মাঝে কালো আকাশ দেখতে লাগলেন জানলা দিয়ে। এক গাদা ঝকঝকে তারা দেখা যেতে লাগল।

একটু ভয় ভয় করতে লাগল তাঁর।

লোকটির আওয়াজ যেন আরো বাড়তে লাগল—বুকের ভেতরকার শোঁ শোঁ আওয়াজ ছাড়াও মুখ দিয়ে হেঁ-এ-ক্, হেঁ-এ-ক্ করে আওয়াজ বেরুতে লাগল। হঠাৎ ধড়মড় করে লোকটা উঠে বসল। তারপর আবার মুড়িসুড়ি দিয়ে পড়ে গেল হঠাৎ।

ওষুধ খাওয়ানোর সময় হয়েছে।

ওষুধ মানে বোতলের লাল জলে মিকশ্চার। ডাক্তারবাবুই তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এক দাগ ওষুধ গেলাসে ঢেলে তিনি প্রায় জোর করেই মুখে ঢেলে দিলেন। আর ঠিক সেই সময়েই তাঁর বুকটা কেমন করে উঠল—মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। আজকাল তাঁর বেশি পরিশ্রম হচ্ছে। ইস্কুলে পড়ানো, খাতা দেখা, ছাত্র পড়ানো—নিজের ছেলেমেয়েদের শাসন, গৃহিণীর

সঙ্গে মন কষাকষি, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ—এগুলো তো বরাবরই আছে, আর তারই ফলে ক্রমশ তাঁর শরীরটা ভেঙে পড়ছে। এখনো প্রায়ই বুকে ব্যথা হয়—কাউকে তা অবশ্য বলেন না। তিনি ভাল করেই জানেন, বলে কোনো লাভ নেই।

ঝিম ধরে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। মনে পড়ল তাঁর শরীরের অবস্থা খারাপ হয়েছিল একদিন। হেডমাস্টার মশাই বলেছিলেন, আপনি সপ্তাহ দুই গরমের ছুটিতে কোথাও ঘুরে আসতে পারেন তো। মধুপুর বা পুরী কোথাও। মনে পড়ল তিনি হেসে বলেছিলেন, কই, শরীর আমার ঠিকই আছে। আমার অসুস্থ হবার উপায় নেই। কোথাও ঘুরে আসতে আজকালকার বাজারে কম খরচ নাকি? তাঁর এক কাকার বাড়ি জলপাইগুড়িতে গিয়ে থাকা যায় কিছুদিন, কিন্তু তা যাতায়াত খরচ ইত্যাদিতেই তো শ' তিনেক টাকার উপর লাগে। সে টাকাও নেই।

হঠাৎ তাঁর মনে হল শিগ্‌গীরই তিনি যাবেন—জলপাইগুড়িতে, বড়দিনের ছুটিতে। টাকার ভাবনা নেই। লোকটা মরেই যাবে—আর বেঁচে উঠলেও সে জানবে কেমন করে তার পকেটের টাকা কোথায় গেল?

...কমলা......কমলা...

লোকটা বলছে। চক্কোত্তি মাস্টার তার কাছে গিয়ে বলল, কি বলছেন আপনি, ও কৃপানাথবাবু? লোকটি আচ্ছন্নের মত বলল—আমি আর বাঁচব না। আমি মরে যাচ্ছি। তলিয়ে যাচ্ছি। আমার পাখা হয়েছে, আমি উড়ছি!

—না, না, না! বললেন চক্কোত্তি মাস্টার।

—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাব। চলে যাব। আমাকে ছেড়ে দাও। খুন করব তাকে। লোকটি বলল।

—চুপ করুন। চুপ করে থাকুন—উত্তেজিত হবেন না। চুপ করে থাকুন।

চক্কোত্তি-গৃহিণী এসে বললেন, লোকটা বকছে—ঘুমুতে দেবে না।

চক্কোত্তি মাস্টার চেঁচিয়ে বললেন, তুমি আজ এঘরে থেকো না, পাশের ঘরে যাও। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও, যাও, যাও !! বলে হাঁফাতে লাগলেন তিনি।

গৃহিণী স্বামীর এমন মূর্তি আগে দেখেননি কখনো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দুম দুম করে পা ফেলে চলে গেলেন।

যাক বাঁচা গেল। বললেন মনে মনে চক্কোত্তি মাস্টার।

লোকটি হাত-পা ছুঁড়ছে এখন। বলছে, আমি কোথায় এখন ?... আমি যাব...মনতারা...মনতারা...ওখান থেকে আমি পালিয়েছিলাম ...পালিয়ে গিয়েছিলাম কোরাপুট...উড়িষ্যায়...ছোটখাট কাজ করে কঠিন পরিশ্রম......।

হাঁফাতে লাগল। নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘন ঘন। বুক ওঠা-নামা করতে লাগল—শোঁ শোঁ আওয়াজ হতে লাগল। একটা শেয়াল উঠোনের উপর এসে হঠাৎ হুয়া হুয়া করে চেঁচিয়ে উঠল।

কমলা আমাকে বিয়ে করতে চায়নি......আমার কিছু ছিল না, কিছু না......লেখাপড়া করিনি......চাকরি নেই। তাকে আমি ভালবাসতাম...।

আর বলতে পারল না। লোকটি কি যেন বলতে চায়—এই অবস্থাতেও সে কাউকে কিছু বলে যেতে চায়। চক্কোত্তি মাস্টার শুনতে লাগলেন আর ভাবতে লাগলেন, লোকটা কখন চুপ করবে। কখন মরবে—সে কি বেঁচেই থাকবে নাকি। দেবে নাকি গলাটা টিপে ? হঠাৎ তাঁর হাসি পেল। না, গলা টেপার কথাটা ভাবাই অন্যায় হয়েছে।

কিন্তু টাকাটা ? ও যদি বেঁচে উঠে বলে টাকাটা দিন তো দেখি ? তাহলে কিছুই হবে না। ছেলেমেয়েদের জামাজুতো হবে না। জলপাইগুড়িতে যাওয়া হবে না।

কি করবে সে ? ওর এরকম বকর বকর কতক্ষণ চলবে। তাঁকে ঘুমুতে হবে। তিনি জামাটাকে খুলে ফেললেন গা থেকে। ঠাণ্ডা হাওয়া জানলা দিয়ে আসছে। সেটা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু

ঘুমুতে পারলেন না তখনি। লোকটির বকর বকর শুনতেই লাগলেন। ব্যাপারটা কিছু আন্দাজে বুঝতে পারলেন।

মনতারা গ্রামে সে ছিল একজন শক্ত যোয়ান লোক। ভাল সাঁতার কাটত, গাছে উঠতে পারত আর মনটা ছিল দিলদরিয়া। বাড়ির অবস্থা ছিল খারাপ। পড়াশুনা হয়নি। গ্রামেই ছিল কমলা—তাকে সে ভালবাসত। প্রায় রোজই তার বাড়িতে যেত। একদিন সে বলল আসল কথাটা। কমলা হেসে ফেলল—হাসতে হাসতে তার যেন দম ফেটে যেতে লাগল—হা হা হা……তুমি বিয়ে করবে, বিয়ে? তোমার কি আছে? টাকা কোথায় তোমার?

ভাবল চক্রোত্তি মাস্টার। হঠাৎ তাঁর বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে গেল। মাথাটা আবার ঝিম ঝিম করে উঠল। চারিদিকে রাশি রাশি ফুল। হলুদ রঙের কত রকম ফুল, কত লাল জবা, স্থলপদ্ম। মনে পড়ল তাঁর দেখা কৃষ্ণচূড়া, বিগনলিয়ার রাশি। সব ঘুরতে থাকল তাঁর চোখের সামনে অন্ধকারের সঙ্গে।

পরদিন চক্রোত্তি মাস্টারকে মৃত অবস্থায় দেখা গেল মেঝেতে। লোকটি তখন ঘুমচ্ছে। ডাক্তারবাবু এসে বললেন, লোকটি বোধ হয় বেঁচে যাবে। মাস্টার মশাই কেন যে মরলেন তা ডাক্তারবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না। কেবল ভাবলেন, কালই টাকাটা নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। এখন কি আর তা পাওয়া যাবে? যত সব!

শ্রাদ্ধের দিন ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার সময় তোশকের তলায় পাওয়া গেল ছশো পঞ্চাশ টাকা। চক্রোত্তি মাস্টারের বিধবা বললেন, লোকটি কি রকম গোপন স্বভাবের আর কৃপণ ছিল যে! একটি টাকা চেয়ে কখনো তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, একটা কড়াই কিনতে বলছি সেই কবে থেকে—পয়সা নেই বলে কেনেনি। অথচ এত টাকা সে জমিয়ে রেখেছিল—আরো কোথায় সে কত জমিয়ে রেখেছে গোপনে কে জানে?